পার্বত্য তথ্য কোষ

৬

১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক

মরহুম আতিকুর রহমান

লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ'

০১ সেট বই তাঁর ছেলে

ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর

পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ -৬

প্রতিবেদন গুচ্ছ

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই : পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০

লেখক : আতিকুর রহমান

প্রকাশক : পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট

প্রকাশ কাল : নভেম্বর ২০০৭ ইং

কম্পোজ : বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।

পেষ্টিং : আবু তাহের ঐ

মুদ্রাকর : বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
: মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ : শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক : ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য : খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-

যোগাযোগে : আতিকুর রহমান মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮

ভূমিকা ঃ

পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতারা অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী দেশদ্রোহী ও গণহত্যার হোতা। পাহাড়ী বাঙ্গালী হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ লোককে তারা হতাহত উচ্ছেদ ও নিঃসম্বল করেছে। বাংলাদেশের ৯৯% অধিবাসী বাঙ্গালীরা এদেশের স্থায়ী ও আদি অধিবাসী। পার্বত্য উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়, বহিরাগত। এই ইতিহাসের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির নেতারা বাঙ্গালীদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহিস্কার দাবী করে, যা জঘন্য অপরাধ। গণহত্যা মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশদ্রোহ, আর বাঙ্গালী বিতাড়ন দাবী অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। এটা বিনা বিচার ও শাস্তিতে পার পেতে পারে না। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধারা নম্বর ৫২ তাদেরকে বহিরাগত অভিবাসী রূপে চিহ্নিত করেছে। বৃটিশের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অনুমোদিত সাধারণ নির্বাচনে ভারতব্যাপী ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে প্রদেশ ও কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিরা ছিল সে সময় ভোটাধিকার বঞ্চিত। ভোটাধিকার বঞ্চিত উপজাতীয়রা তখন তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেনি। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভাবা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা তখন স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দারূপে গণ্য ছিলো না। তাই তাদের ভোটাধিকার হীন রাখা ছিল যথার্থ। এই মূল্যায়নটিকে মৌলিক ও যথার্থ ভাবা যায়, যা এখনো প্রয়োগ ও প্রবর্তন যোগ্য। তবে পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই মূল্যায়নটির ব্যতিক্রম করে পার্বত্য উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দান করা হয়, যা যথার্থ ছিল না যা এখন প্রত্যাহার যোগ্য। এখন পাকিস্তান আমলের ভোটাধিকার দানকে অব্যাহত রেখে উপজাতীয়দের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা একটি ভুল। এখন এর সংশোধন করা আবশ্যক। এই ভুলেরই প্রতিফল হলো আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে জনসংহতি সমিতির বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের অধিকারকে অস্বীকার, পর্বতাঞ্চলে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

বিদ্রোহী উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দানের ভুলকে উদারতা ভাবা হলেও, তাতে কোন সুফল ফলেনি। এটি হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে আত্মহননের শামিল।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী, রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট।

পার্বত্য তথ্য কোষ

খণ্ড-৬ ঃ প্রতিবেদন গুচ্ছ

সূচীপত্র ঃ

পাবর্ত্য সমস্যার সমাধানে করণীয়

(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক পৃষ্ঠা-৫, মতামত তাং-১৪ জানুয়ারী ২০০৩)

শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে এখনো রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রশাসনিকভাবেও প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল উপেক্ষিত। সময়ই যেন একদা সমাধান এনে দিবে, তারই অপেক্ষায় কাল ক্ষেপণ চলছে। কিন্তু সমস্যাক্রান্ত লোকেরা তাতে প্রবোধ মানছে না। তাদের পক্ষে কিছু করা দরকার। কিন্তু সে করাটা করবে কে? রাজনীতিকরা ব্যর্থ। প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরাও সাহস হারা। তাদের কাছে ক্ষমতা পদ ও চাকুরী স্বার্থটাই বড়।

পার্বত্য সমস্যাটি বহুমাত্রিক ও বহু দিনের সৃষ্ট। এটি আস্তে আস্তেই স্তূপিকৃত হয়েছে। এর দায় অতীত থেকে এখন পর্যন্ত বহুজনের উপর বর্তায়। এখন তুবড়ি মেরে মুহুর্তে এ থেকে রেহাই পাওয়াও দুষ্কর।

আশার কথাঃ ৮ম জাতীয় সংসদে পার্বত্য অঞ্চল সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব এম,কে,আনোয়ার, সংসদকে আশ্বস্ত করেছেন যে, পার্বত্য চুক্তির অসাংবিধানিক ধারা সমূহ বাস্তবায়িত হবেনা। অথচ সংবিধান লঙ্ঘনের ব্যাপার সমূহ বিষদ আলোচনায় আসছেনা, উহ্যই থেকে যাচ্ছে। বিষয়টি, সিনিয়র আইনজীবী ও খোদ সুপ্রীম কোর্টকেও সংক্ষুব্ধ করছে না। এ বিষয়টি কেবল আইন লঙ্ঘনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশ ও জাতির বিভক্তির সম্ভাবনাতেও সম্পৃক্ত। বাঙ্গালীরাও তাতে বিভ্রান্ত। মন্ত্রী জনাব মান্নান ভূঁইয়া বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তিনি ইউএনডিপি ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিতে বলেছেন; চুক্তির প্রতিটি ধারা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং হবে। তাই চুড়ান্ত বিপদের আশংকা অবশ্যই করা যায়।

পৃথক জাতিত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম ভিত্তিও তাই। বসনিয়া পূর্ব তিমুর ইত্যাদি স্বতন্ত্র জাতি রাষ্ট্র সমূহ, এই ভিত্তিতেই সৃষ্ট। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, এই একই পথে ধাবিত। ব্যতিক্রম হলোঃ এখনো এখানে বিচ্ছিন্নতার দাবী ওঠেনি। এই অবসরটুকু হলো আমাদের পক্ষে সতর্ক হওয়ার সময়। দেশের অখন্ডতা, সংবিধান ও পার্বত্য চুক্তিকে অবলম্বন করে আমাদের আঁট ঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

পার্বত্য চুক্তিটাই আমাদের পক্ষে হস্তক্ষেপের সুযোগ এনে দিয়েছে। চুক্তিতে দুই বিপরীত ধারা বিদ্যমান। একটি হলো সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা মান্যতার ও অপরটি তা লঙ্ঘনের।

চুক্তিপত্রের মুখবন্ধ হলো একটি উদার অঙ্গীকার, যথাঃঃ"বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, নিম্নবর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, ., ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনিত হইলেন।"

এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধান্তমূলক নীতি ও অঙ্গিকার হলোঃ

(ক) চুক্তিটি বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় রচিত হবে, তথা তদ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত হবে না।

(খ) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য বহাল রাখা হবে।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিক, তথা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে বসবাসরত সবাই, কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ ছাড়াই, এমনকি বাংলাদেশের অন্য সব নাগরিকরাও এই পার্বত্য অঞ্চলে নিম্নোক্ত অধিকার ও সুবিধাবলী ভোগ করবেন, যথাঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার ও উন্নয়ন।

চুক্তির এই অনুকূল ধারা, পরবর্তী দফাওয়ারী বর্ণনায়, বিপরীত ব্যবস্থাদির দ্বারা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। চারখন্ডে বিভক্ত এই চুক্তি রোয়েদাদ, মুখবন্ধের অঙ্গিকার অনুসারে সংবিধান সম্মতভাবে রচিত হয়নি। তাতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬, ৪২, ১২২ ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এগুলো আইনী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত লঙ্ঘনের বিষয়গুলো, আন্তসাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক শান্তি, স্বার্থ, সংহতি, সমতা, সুবিচার ও গণতন্ত্রকেও বিঘ্নিত করে, এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিবর্তে, উপজাতীয়তাকে উস্কানী দেয়, যা সংবিধানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়।

চুক্তিতে নিহিত সংবিধান বিরোধী ধারা সমূহ, যথা ঃ-

১। **খন্ড (ক)-১** ঃ এই দফায় ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইনে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেবল উপজাতি অধ্যূষিত অঞ্চলরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এবং আদমশুমারী মতে, বাঙ্গালীরা স্থানীয় প্রধান সম্প্রদায়। জনসংখ্যায়ও তারা প্রায় অর্ধেক। এখানে একমাত্র উপজাতীয়দের স্বীকৃতি দেয়াতে, এতদাঞ্চল একক উপজাতীয় আবাসভূমি রূপে স্বীকৃত হওয়ায় তাদের অগ্রাধিকার, বিশেষাধিকার, স্বায়ত্ত শাসন এমন কি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের রাজনৈতিক পথ খোলাসা হয়ে গেছে। এই সাথে বাঙ্গালীরা হয়ে পড়েছে অবহেলিত জিম্মি। এ হলো দেশ ও জাতির বিভক্তির রাজনৈতিক সূত্র। এতে একক এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও জাতি-সত্তার সংবিধান প্রদত্ত ধারণা ক্ষুন্ন হয়েছে, যা অনুচ্ছেদ নং- ১ ও ৬ (২) দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। আঞ্চলিকতা ও উপজাতীয়তা এই আইনে নিষিদ্ধ।

২। **খন্ড (খ)** ঃ এই দফা হলো, পার্বত্য রাঙ্গামাটি / খাগড়াছড়ি / বান্দরবন জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। বর্ণিত এই তিন জেলা পরিষদের জন্য এমন স্বতন্ত্র আইন রচিত ও জারি হয়েছে, যা বাংলাদেশের অপরাপর জেলা পরিষদের পক্ষে অভিন্ন নয়। এটা আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও আইনী বৈষম্য সম্পন্ন। সংবিধানের ধারা নং- ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬, ও ৪২ এই বৈষম্যাদি অনুমোদন করে না।

খন্ড (খ) ১। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং- ২ (ক) ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং-২ (খ) তে পার্বত্য অবাঙ্গালীদের উপজাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বাঙ্গালীদের

হয়েছে।

পার্বত্য সমস্যার মূল অনুধাবনে এখানে তার অতীত আলোচিত হওয়া দরকার। আসলে চট্টগ্রামেরই অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম। উপজাতীয়রা চট্টগ্রামী জন সমষ্টির অংশ নয়। তারা নিজেরা চট্টগ্রামী মূলের লোক বলেও দাবী করেনা।

১৮৬০ সালে পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল রূপে এতদাঞ্চলকে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়েছে। এতদাঞ্চল ছিলো বন ও পাহাড়ের সমষ্টি, এক বসতি বিরল ভূ-ভাগ। বৃটিশ আমলের শুরুতে, আরাকানে বর্মী আক্রমণ, এবং পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ কার্যক্রম, ত্রিপুরা, লুসাই ও আরাকানী জাতি গোষ্ঠীর লোকদের ব্যাপক সংখ্যায় বাস্তুচ্যুত করে, এবং তারা সংঘাতপূর্ণ নিজ নিজ বসতি এলাকা ত্যাগ করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরুপদ্রব ও দুর্গম পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ঐ উদ্বাস্তু শরণার্থীদেরই বংশধর হল বর্তমান পার্বত্য উপজাতীয়রা। যারা চট্টগ্রামে ছিলো নেহাত সংখ্যালঘু, এবং স্থানীয় না হলেও, আরাকান, লুসাই ও ত্রিপুরা দখলের ফলে বৃটিশ প্রজা। এই প্রজা অধিকারের পাশাপাশি, চট্টগ্রাম অঞ্চল, পাহাড়ে ও সমতলে, উত্তরে, দক্ষিণে বিভক্ত আর দুই প্রশাসনভূক্ত হওয়ার ফলে, আকস্মিক ভাবে, পূর্বাঞ্চলে উপজাতীয় গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এবং সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত ভাবে, তারা এর রাজনৈতিক সুফলভোগী হয়ে দাঁড়ায়।

কার্যতঃ বার্মা বিতাড়িত চাকমা, মগ ইত্যাদি আরাকানীরা ছিল বৃটিশ অনুগৃহীত, তাই তাদের অনুগত। আর ত্রিপুরা, লুসাই ও কুকীরা ছিলো বৃটিশ আক্রান্ত, তাই তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত। এই পরিবেশ পরিস্থিতি, বৃটিশ অনুগতদের স্বার্থানুকূল হয়। তখন অনুগত শরণার্থীদের তিন দলপতিকে বৃটিশ সরকার সর্দারী, আর্থিক সুবিধা, ও সামন্তীয় মর্যাদা দান করেন। তাদের নেতৃস্থানীয়দের মৌজা প্রধান রূপে নিযুক্ত করা হয়। চট্টগ্রামী তথা বাঙ্গালী প্রাধান্য আর আধিপত্যের বিলুপ্তি এভাবেই সাধিত হয়। এই উপজাতীয় আধিপত্য ও প্রাধান্যকে শেষমেষ রেগুলেশন নং- ১/১৯০০ এর দ্বারা আইনী ও স্থায়ী রূপ দেয়া হয়। বৃটিশ শাসনের অবসানে সামন্ত প্রথার বাহন দেশীয় রাজ্য আর জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র, পশ্চিম-উত্তর-সীমান্তের কাবায়েলী স্বায়ত্ত শাসনের অনুকরণে, পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তের পার্বত্য চট্টগ্রামেও সর্দারী সামন্ত প্রথা বহাল রেখে দেয়। এটাই পরিণামে শক্তিশালী উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের সংগ্রাম ও বিদ্রোহে পরিণত হয়। যদি ১৯৫১ সালে জমিদারী উচ্ছেদের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্দারী সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধিত হয়ে যেতো, এবং সারা দেশের মত স্থানীয় ভূমি প্রশাসন, রাজস্ব বিভাগাধীন তহসিলের নিকট হস্তান্তরিত হতো, তা হলে স্থানীয়ভাবে ভূমি প্রশাসন নির্ভর, আঞ্চলিকতাবাদী উপজাতীয় রাজনীতিক শ্রেণীর জন্ম হতো না। বাংলাদেশ আমলেও তহসিল প্রথা প্রবর্তন না করা হয়েছে গুরুতর ভূল। ফলে উপজাতীয়দের ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব ভোগজাত আধিপত্যের উৎপাত জোরদার হতে পেরেছে।

বলা হয়েছে অউপজাতি। এ মূল্যায়ন ও নামকরণ অযৌক্তিক। বাঙ্গালীরা বহু কোটি সংখ্যক একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। জনসংখ্যা হিসাবে স্থানীয়ভাবে ও তারা একক প্রধান সম্প্রদায়। তাই এই প্রধান সম্প্রদায়টির পক্ষে নিজ নামে আখ্যায়িত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। তাদের বিপরীতে উপজাতীয় সংখ্যালঘু লোকদের অবাঙ্গালী নামে আখ্যায়িত হওয়াটাই যথার্থ। এখানে উপজাতীয়তার প্রাধান্য দেয়ায়, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক গুরুত্বেরই অবতারণা হয়েছে, যা সংবিধানের ১ ও ৬ (২) অনুচ্ছেদে ব্যক্ত ধারণার পরিপন্থী।

৩। **খন্ড (খ) ৪ / (ক) ও (খ)** ঃ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং- ৪/১ (ক, খ, গ ও ঘ) চেয়ারম্যান পদসহ উপজাতিদের পরিষদের ২/৩ এবং বাঙ্গালীদের ১/৩ সদস্য পদ দান করেছে। এ বিধি ব্যবস্থা সংবিধানের ধারা নং- ৯, ১১, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ এর প্রকাশ্য লঙ্ঘন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার বিশেষাধিকার ও পদ সংরক্ষণ মান্য নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা নং- ১, ৯, ১১, ৪৮, ৫৫, ৬৫, ১২২ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অনুকরণে বর্ণিত পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদদের আইন ও নির্বাচন বিধি রচিত হয়নি। মনোনয়ন ভিত্তিক অবাধ যুক্ত নির্বাচনই সংবিধান ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুমোদন করে।
সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। সে অবধি প্রেসিডেন্সিয়েল সরকার ও শাসন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত। অথচ অনেক বিভাগীয় সংস্থা ও স্থানীয় শাসন ভিত্তিক পরিষদ আর প্রতিষ্ঠান এখনো প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান শাসিত। পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ সমূহ এই পদ্ধতিতে পরিচালিত, যা দ্বাদশ সংশোধনীর পরিপন্থী। উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী গণতন্ত্রের সাথেও সামঞ্জস্যহীন।

৪। **খন্ড (খ) ৪-গ** ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা নং- ৪ (৬) ও ৪ (৫) পাহাড়ী বাঙ্গালীদের সবাইকে স্থানীয় বাসিন্দা ও নাগরিক সনদ লাভ প্রশ্নে উপজাতীয় সার্কেল চীফদের অধীন এবং এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের কর্তৃত্ব বিলোপ করা হয়েছে। অথচ মৌলিক আইন অনুযায়ী স্থানীয় জেলা প্রশাসকরাই এ জাতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী। জমিদারী ও সর্দারী সামন্তবাদ, ১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাতস্বত্ব আইন (আইন নং- ২৮/১৯৫১) এবং বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১ ও ৭ কর্তৃক বাতিল হয়ে গেছে। তদুপরি উপজাতীয় সর্দারদের কর্তৃত্ব বাঙ্গালীদের উপর প্রযোজ্যই নয়। যথা ঃ পার্বত্য শাসন আইন নং- ৩৫।

৫। **খন্ড (খ) ৯** ঃ এ দফা ও জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রূপে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার শর্ত আরোপিত হয়েছে, এবং স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সনদ পেতে কেবল বাঙ্গালীদের জন্য শর্ত হলো জায়গা জমির মালিকানা, ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানার অধিকারী হওয়া। অথচ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১২২ এরূপ কোন শর্ত আরোপ করে না। এখানে বিবেচ্য যে, বাংলাদেশী গণপ্রজাদের অর্ধেকই প্রায় ভূমিহীন। অথচ অনুচ্ছেদ নং- ১, ৭ ও ১১ তাদের এই প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিকদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পার্বত্য

উপজাতীয়দের স্থানীয় আদী ও স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ার কারনে ভোটাধিকার দান করে নি। তাই তারা ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ভোটার ছিলো না।

৬। **খন্ড (খ) ১৩ ও ১৪, খন্ড (গ) ৭, খন্ড (গ) ১০, ও খন্ড (ঘ) ১৮** ঃ এই দফা সমূহ ও সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা নং- ৩১, ৩২ (২) এবং ২৮ ও ২৯-এ, নিযুক্তি ও চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই বৈষম্য ও ভেদাভেদ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুমোদন করে না।

৭। **খন্ড (খ) ২৬ (ক ও খ)** ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং- ৬৪ পরিষদীয় এলাকা ও পরিষদমুক্ত এলাকা সুনির্দিষ্ট করেছে। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য অঞ্চলকেই পরিষদভূক্ত রাখা হয়েছে। এটা চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট আইনকে অমান্য করা, যা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। জরিপের মাধ্যমে পরিষদীয় এলাকা ও পরিষদমুক্ত এলাকা সুনির্দিষ্ট হয়নি। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য অঞ্চলকেই পরিষদভূক্ত রাখা হয়েছে ও সুনির্দিষ্ট আছে। আমার হিসাবে তিন পার্বত্য জেলা মিলে পরিষদীয় এলাকা মাত্র ৪৪০ বর্গমাইল, এবং জনসংহতি সমিতির হিসাব মতে তা ৪৪৬ বর্গমাইল মাত্র। অথচ সরকার তিন জেলা পরিষদের হাতে গোটা পার্বত্যঞ্চল তথা ৫০৯৩ বর্গমাইলই ছেড়ে দিয়েছেন, এবং তাতে জেলা পরিষদের ভূমি নিয়ন্ত্রণ মূলক পূর্বানুমোদন মেনে নিয়েছেন। এতে জমি বন্দোবস্তি, হস্তান্তর, নামজারি, ও অধিগ্রহণ বন্ধ আছে। অথচ ভূমি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সার্বভৌম ক্ষমতাধীন বিষয়। এটি প্রত্যাহারযোগ্য নয়। দুঃখ জনক হল, যে জায়গা জমি ও অঞ্চল নিশ্চিত রূপে পরিষদীয় এখতিয়ারভূক্ত নয়, তা থেকে সরকারী হাত গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং বর্ণিত দফা ও আইনে এ বলা নিরর্থক যে, "তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা, ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে, এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।" (সূত্রঃ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং- ৬৪ ও পার্বত্য শাসন আইন নং- ৩৫)।

৮। **খন্ড (খ) ১৬ (গ)** ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গিকারে বলা হয়েছে যে, কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার সাবেক মালিকদের বন্দোবস্তি দেয়া হবে। বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। শুকনো মৌসুমে বর্তমানে ১৫/২০ হাজার একরের বেশি জমি ভাসে না, এবং তাতে নিকটবর্তী লোকজনেরাই ফল ফসল ফলায়। কিন্তু একদা ভবিষ্যতে হ্রদ এলাকা ভরে যাবে, এবং তার অধিকাংশই ভেসে উঠবে। তখন পূনঃ আবাদ ও বন্দোবস্তির সুযোগ দেখা দিবে। তবে হ্রদ অঞ্চলভূক্ত ১, ৬৩, ৮৬৩ একরের মধ্যে কেবল ৫৪ হাজার একর জমি মাত্র ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিলো, এবং অবশিষ্ট ১, ০৯, ৮৬৩ একর জমি ছিলো সরকারী খাস ও বনভূমি। নিকটবর্তী ভোগ দখলকারী লোক ও অন্যান্য ভূমিহীনদের বঞ্চিত করে, পূর্বের ক্ষতিপূরণের দ্বারা স্থানান্তরিত ও পূনর্বাসিতদের ঐ সব জমিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্দোবস্তি দান হবে অযৌক্তিক। পরিবেশগত কারণে ও সাবেক মালিক ও তাদের বংশধরদের অধিকাংশ হ্রদ অঞ্চল ও

তার আশে পাশে নেই, এবং প্রাপ্তব্য জমিও হবে, তাদের ছেড়ে যাওয়া জমির চেয়ে দ্বিগুন। তাদের পক্ষে এই ঢালাও অধিকার প্রাপ্য নয়।

৯। খন্ড (খ) ৩০ ও ৩১ ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং- ১২ ও ৭০ চেয়ারম্যানকে সাসপেন্ড করণ ও অন্য কারো কাছে ক্ষমতা অর্পন থেকে সরকারকে বারণ করা হয়েছে, যা কার্যতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা ত্যাগ।

১০। খন্ড (খ) ৩৩ ও ৩৪ ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা তফসিলে, আইন শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষন ও তাঁর উন্নতি সাধন পরিষদের ক্ষমতাভূক্ত করা হয়েছে। অথচ জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় শাসন ভিত্তিক অধঃস্তন প্রতিষ্ঠান, এবং এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে একমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনই মান্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১ ও ৫৯ সমূদয় মৌলিক ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় সরকার ভিত্তিক করে রেখেছে। স্থানীয় শাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানাদি কেবল কেন্দ্রীয় মোসাহেবী ক্ষমতারই মালিক, তার বেশি নয়।

জেলা পরিষদ আইন ৬৪তে ভূমি প্রশাসন ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রদত্ত হয়েছে অথচ ভূমি প্রশাসন মৌলিক কেন্দ্রীয় বিষয়। ভূমি প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিষয় নয়। স্থানীয় ক্ষমতা তফসিলে এ সবের অন্তর্ভূক্তি, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পক্ষে ক্ষতিকর। এসব অনুমোদনীয় নয়। এ জাতীয় ক্ষমতা ক্ষুদে উপজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে, এবং তাতে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, সংবিধান মান্যতা, এবং একক স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গিকার হবে ক্ষুন্ন।

১১। খন্ড (গ) তে আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চুক্তিভূক্ত খন্ড (খ) ২৬ ও জেলা পরিষদ আইন ৬৪ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিষদভূক্ত করেনি। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই পরিষদীয় এলাকারূপে হস্তান্তরিত হয়ে আছে। এ খেলাপী কাজের হোতা জন সংহতি সমিতি নয়, সরকার নিজে, এবং এর দ্বারা গোটা পার্বত্য অঞ্চলই বিরোধীয় অঞ্চলে পরিণত হয়ে গেছে। বসতিভূক্ত অঞ্চল ৪৪০ বা ৪৪৬ বর্গমাইল থেকে বেড়ে, গোটা ৫০৯৩ বর্গমাইলে পরিণত হয়েছে। পরিষদীয় শাসন সম্প্রসারণের এই বাড়াবাড়ি, আসলে চুক্তিজাত কিছু নয়। চুক্তির বলে জন সংহতি সমিতি, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিষদীয় এলাকা বলে দাবী করতে পারে না। বরং এই বলে কিছু বাড়তি অঞ্চল দাবী করতে পারে যে, আবাদী সম্প্রসারণ ও বন্দোবস্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল সঙ্কুচিত হয়ে, বাস্তবে বসতি অঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটেছে, এবং তা কার্য্যতঃ বনাঞ্চল থেকে অবমুক্ত হয়ে বসতি অঞ্চলের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এ দাবী মেনে নিলেও, বসতি অঞ্চল তথা পরিষদীয় অঞ্চলের আয়তন, গোটা পার্বত্য অঞ্চলের অর্ধেকের বেশী হয় না। এরূপ বাড়াবাড়ি পার্বত্য সমস্যা সৃষ্টির উদাহরণ। বৃটিশ আমল থেকে এভাবে প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে সমস্যাদির সৃষ্টি করা

১২। **খন্ড (গ)- ১ এ বলা হয়েছে ঃ** তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে, এবং বাস্তবেও তাই হয়েছে। অথচ সংবিধানে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের রূপরেখা ভিন্ন, যথাঃ

"অনুচ্ছেদ নং- ৫৯ (১) ঃ আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"

বর্ণিত এই সাংবিধানিক রূপরেখায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি, যথা ঃ-

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট বা একাংশ নয়।

(খ) এখনো দেশ ভিত্তিক কোন আইনী স্থানীয় শাসন কাঠামো প্রণীত হয়নি।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধান সম্মত শাসন প্রতিষ্ঠান নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১ অনুসারে গোটা বাংলাদেশ একক রাজনৈতিক ইউনিট। এর কোন আঞ্চলিক ভাগ বিভাগ নেই। এ হেতু রাজনৈতিকভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ইউনিট নয়। এই শূণ্য অস্তিত্ব নিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত।

১৩। **খন্ড (গ)** ২ ও সংশ্লিষ্ট আইনে, আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানকে পরোক্ষ ভাবে, কেবল উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। এবং খন্ড (গ) ১২ ও সংশ্লিষ্ট আইনে, অনির্বাচিত অন্তরবর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানে, পরোক্ষ নির্বাচন, ও অন্তরবর্তী ক্ষমতা দান বা গ্রহণের কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বিধান নেই। এই বাড়াবাড়ি সংবিধান সম্মত নয়।

১৪। **খন্ড (ঘ) ৪, ৫ ও ৬ (খ)** বলে, একটি ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে, যার চেয়ারম্যান হবেন একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। তাতে সদস্য হবেনঃ-

১) চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার বা অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

২) সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় সার্কেল চীফ।

৩) আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি।

৪) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়রম্যান বা প্রতিনিধি।

এই ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হলো ঃ-

ক) জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিস্পত্তি করা।

খ) অবৈধভাবে যে সব জায়গা জমি ও পাহাড়, বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে, সে সব জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করা।

এই কমিশনের রায় হবে চুড়ান্ত। এর বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজাতীয়দের ভূমি সংক্রান্ত অভিযুক্ত পক্ষ হলো বাঙ্গালীরা। বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে জাতিগত ও রাজনৈতিকভাবে তাদের আপত্তি হলো ঃ বিগত জিয়া সরকার, স্থানীয় উপজাতীয় মৌজা প্রধান ও সার্কেল প্রধানদের অনুমোদন ছাড়া,

স্বউদ্যোগে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছেন। মৌজা ও সাকেল ব্যবস্থা, হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল আইনে প্রতিষ্ঠিত। মৌজা হেডম্যান ও সার্কেল চীফদের অনুমোদনে ভূমি প্রশাসন প্রচলিত। জিয়া সরকার এই প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রথা, রীতি ও পদ্ধতি লঙ্ঘন করে, বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছেন। তাতেই বাঙ্গালীদের প্রদত্ত জমি ও পাহাড়ের বন্দোবস্তি ও দখল স্বত্ব অবৈধ বলা হয়েছে।

এই অভিযোগের বিচার কাজ এমন এক বিচারপতির হাতে ন্যস্ত হয়েছে, যিনি অভিযুক্ত সরকারের দ্বারাই নিযুক্ত। তার সহযোগীও সরকারী কর্মচারী। অবশিষ্ট তিন সদস্য হলেন অভিযোগকারী পক্ষভূক্ত নেতৃস্থানীয় লোক। সুতরাং এই কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নয়। এই বিচার ব্যবস্থাকে আপীল বহির্ভূত রাখা আরেক অবিচার। তদুপরি সরকারের বসতি স্থাপন ও বন্দোবস্তি দান ইত্যাদি সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা তো একমাত্র সুপ্রীম কোর্টেরই প্রাপ্য। ভূমি কমিশন সুপ্রীম কোর্টের এই এখতিয়ারের উপর হস্তক্ষেপের অধিকার রাখেনা।

১৫। **খন্ড (ঘ)** ১৯ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায়, উপজাতীয়দের মধ্য থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা সংবিধানের ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদ বিরোধী।

এই অভিযোগগুলো, আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত খুঁটি নাটি বিচারে গুরুতর তো বটেই, এতে দেশের সর্বোচ্চ পালনীয় আইন সংবিধান, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, আর সার্বভৌম ক্ষমতা ও হুমকির সম্মুখীন। দেশ জাতি ও সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেনা। এখানে আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নটি জড়িত। আনুষ্ঠানিকভাবে আইনজীবীদের কেউ এই বিষয়টি নিয়ে বিচার প্রার্থী হলে, বা যে কোন সংক্ষুব্ধ নাগরিকের আবেদনে, বা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে আকৃষ্ট হয়ে, স্ব উদ্যোগে বিষয়টি মামলা রূপে সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের জানামতে সুপ্রীম কোর্টে অনুরূপ বহু মামলা গৃহীত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বহু মামলাও সুপ্রীম কোর্টে উথাপিত আছে, যা আইনজীবীদের উদ্যোগের অভাব, অথবা মোসাবেদা সংক্রান্ত ক্রুটির কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে।

আইনজীবীদের অধিকাংশ দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত। দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ও নির্দেশে তারা বিষয়টি বিবেচনা করেন। ফলে দলীয় বিরোধীতা ও রাজনীতি তাদেরকে এ ব্যাপারে দমিয়ে রেখেছে। বাদ বাকি আইনজীবীরা, বিষয়টিকে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসিক মনে করেন। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলাগুলো পরিচালিত হচ্ছে না।

এই নেতিবাচক ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টকেই দুঃসাহসিক উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। এ অনানুষ্ঠানিক মামলার বিষয় হলোঃ পার্বত্য চুক্তি তার মুখবন্ধের অঙ্গিকার অনুসারে রচিত হয়নি, এবং তাতে দফায় দফায় বাংলাদেশ সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে, যা সংশোধন হওয়া ব্যতীত কার্যকর হওয়া আইন সঙ্গত নয়। বিবাদী চুক্তিকারী পক্ষ হলেন- (ক) বাংলাদেশ সরকার ও (খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। অবিলম্বে এই সাংবিধানিক ক্রুটি সংশোধনে মাননীয় আদালতের আদেশই কাম্য।

এখন প্রশ্ন হলোঃ বর্ণিত পরিষদ আইন দেশ ও জাতি ভিত্তিক সার্বজনীন ও অবাধ গণতান্ত্রিক নয়। উপজাতিভূক্ত লোকদের জন্য এটিতে পদ সংরক্ষণ বিশেষ ক্ষমতা ও অগ্রাধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭, ২৯, ও ৩১ অনুমোদন করে না। সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গিকার ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অথচ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে তার ধারাবাহিকতা নেই যথাঃ

সাংবিধানিক আইন ঃ "প্রস্তাবনা। আমরা আরো অঙ্গিকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

"অনুচ্ছেদ ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

"অনুচ্ছেদ ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।"

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্তের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্ননের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

"অনুচ্ছেদ ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"

"অনুচ্ছেদ নং ২৯।

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

"(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।"

এই মৌলিক বিধানগুলো স্থানীয় পরিষদ আইনে বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, যথা ঃ পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও পরিষদ সমূহে মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান পদে বাঙ্গালীদের অযোগ্য করে বিধান করা হয়েছে। সংখ্যানুপাতিক জন প্রতিনিধত্ব বাঙ্গালীদের নেই। মাত্র তিন ভাগের ১ ভাগ সদস্য পদই তাদের প্রাপ্য। এটি অবাধ গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতি লঙঘন। সুতরাং সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ধারা নং ১১ তদ্বারা সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। জমি বন্দোবস্তি,

লাইসেন্স পারমিট প্রদান ও কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতিদের অগ্রাধিকারের বিধান, সংবিধানের ধারা নং ১৯, ২৭, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এর প্রকাশ্য লঙ্ঘন। অনুচ্ছেদ ২৮ (৩) ২৯ (৩) এর বিশেষ ছাড়ও সুবিধা দানের আওতায় অনগ্রসর লোকজন ধর্মীয় আর উপসম্প্রদায়ভূক্ত কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার ও পদ সংরক্ষণের সুবিধা লাভের অর্থঃ মৌলিক অধিকার হরণ নয়। অনুচ্ছেদ ২৬ (১) এর বিধান মতে, অনুরূপ আইন আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে, বা মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন অংশ রহিত হয়ে যাবে যথাঃ

"অনুচ্ছেদ নং- ২৬। এই ভাগের বিধানবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, এই বিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।" (সূত্রঃ সংবিধান, তৃতীয় ভাগ-মৌলিখ অধিকার)

এভাবে চীফদের নির্বাহী ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের স্থানীয় স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার সার্টিফিকেট দানের ক্ষমতা দান, সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত কাজ। সরকারী নির্বাহী ক্ষমতা ছাড়া কারো পক্ষেই জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব প্রাপ্য নয়।

১৫ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ২৯ জুন ১৯৯৯/খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙগামাটি)

এটা নিঃসন্দেহ যে, বিশুদ্ধ এক ইউনিট ভিত্তিক বাংলাদেশে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও ক্ষমতা দান অসাংবিধানিক। আইনতঃ এটা পরিস্কার যে, পার্বত্য পরিষদীয় ক্ষমতা কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই স্থানীয় শাসন ভূক্ত বিষয়। আসলে যদি বিষয়টি তা-ই-হয়, তাহলে এ পরিষদগুলো স্থানীয় শাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন না হয়ে, আগে ছিলো স্পেশাল মন্ত্রনালয়ের অধীন এবং এখন আছে নব সৃষ্ট পাবত্য মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রিত, এ লোকচুরি যথার্থ নয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ঃ জাতীয়ভাবে প্রযোজ্য সাধারণ জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরষদ আইন এখনো রচিত হয় নি। যদি তা পার্বত্য আইন থেকে ভিন্ন হয়, তখন বিশেষ কোন অঞ্জল ও সম্প্রদায় আইনগত প্রশ্রয় পাবে না। যদি পার্বত্য আইন ও সুযোগ সুবিধা ক্ষনস্থায়ী কিছু হয়, তা হলে উপজাতিদের সাময়িক রাজা উজির বাণিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই। আর যদি তা স্থায়ী ব্যবস্থা রূপে চিন্তা করা হয়ে থাকে, তখন ব্যবস্থাটিকে সার্বজনীন কল্যাণ অর্থেই সংগঠিত হতে হবে। ব্যবস্থাটির দুর্বলতা হলোঃ এটি কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই নানাভাবে সাম্প্রদায়িক, পক্ষপাতদুষ্ট, অগণতান্ত্রিক ও একপেশে ব্যবস্থা। স্থানীয় ও সাময়িক ভাবে এর পক্ষে হাততালি জুটলেও পরিণামে এটি হবে কালান্তর। এর প্রবক্তারা ক্ষণস্থায়ী লাভের চিন্তায় মগ্ন। লক্ষ্য অর্জনের পর, হয় তারা নিজেরাই এর মুন্ডপাত করে যাবেন, নয়তো ক্ষমতাসীন বিপক্ষের হাতে তাকে কাতল হতে দিবেন।

প্রশ্ন হতে পারেঃ গোপন লক্ষ্যটা কী?

উত্তর হলোঃ দলীয় রাজনীতির সাফল্য হিসাবে গোলযোগ পূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের কৃতিত্ব প্রদর্শন। জাতীয় নির্বাচন মুহূর্তে বিরূপ জনমতকে বাগে আনতে কৌশল হবেঃ চুক্তির সাফল্য ও শান্তি প্রদর্শন, তৎপর গৃহশত্রু বিভীষণদের বলিদান। ভোট আর ক্ষমতা লাভের পর এক ফুৎকারে উবে যাবে শান্তি চুক্তি পরিষদীয় আইন ও উপজাতীয় ক্ষমতা। পক্ষে বিপক্ষে মাঠ গরম করার ইস্যু এটি। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের পক্ষে বাঙ্গালী স্বার্থের বিরোধীতা করে, ক্ষমতায় ফেরার আশা অবাস্তব কল্পনা। তাই এ

কথা ভাবাই সঙ্গত যে, তাদের পার্বত্য রাজনীতি সব দেয়ার চাতুর্থ ও ফাঁকি সম্বলিত। কেড়ে নেয়ার শেষ খেলাটি বাকি। হয় বশংবদ লেজুড়ে পরিণত হতে হবে, নয়তো মেনে নিতে হবে সব সংশোধন। এ ভাবে সন্তু বাবুদের মহা ফাপরে পড়া আসন্ন।

আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি, উচ্চাভিলাষী চিন্তা পরিহার করুন। ঢালুতে অবস্থিত বাংলাদেশটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার আধিবাসীদের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ এই পর্বতাঞ্চল ও তার অধিবাসীদের ভাগ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বন্ধন জন্মগত। উভয়কে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতায় এগুতে হবে। সাম্প্রদায়িক বৈরীতা বৈষম্য ও উত্তেজনা নয়, সমানাধিকার ও একক রাজনৈতিক লক্ষ্যে সম্মিলিত আন্দোলনেই সাফল্য অর্জন সম্ভব। উপজাতীয়দের এক পাক্ষিক আন্দোলন সাফল্য অর্জনে কখনো সক্ষম হবে না। বিপরীতে ঐক্যবদ্ধ পাহাড়ী বাঙ্গালী আন্দোলন হবে দূর্বার। তাকে কখনো দমান যাবে না। কঠিনতম রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে এই ঐক্য হবে সফল শক্তি। আদি আর নবাগত বিভক্তি নয়, সম্মিলিত পাহাড়ী বাঙ্গালীর আন্দোলনে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমাদর ও সাফল্যেরও সম্ভাবনা প্রচুর। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন রাজনৈতিক সাফল্যের স্বর্ণদ্বার রূপে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

ধর্মান্ধতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগ শেষ। একক ধর্ম বর্ণ সমাজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীগোষ্ঠীভূক্ত লোক অধ্যুষিত দেশ ও জাতি গঠনের চিন্তা অবাস্তব। বিবিধের সহাবস্থানে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশ ও জাতি হয়ে থাকা এবং গড়ে ওঠার চিন্তা চেতনাই সঠিক। প্রত্যেক অন্যায় অবিচারকে মানবিক ও আইনী দৃষ্টিকোণের বিচারে দেখে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। হিংসা বিদ্বেষ ও হানাহানিতে তিক্ততাই বাড়ে, সমস্যার সমাধান হয় না। এ সংশোধিত পথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অগ্রপদক্ষেপ কাম্য। সাধারণ বাঙ্গালীরা তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। সাম্প্রদায়িক একপেশে নীতি ও রাজনীতিটাই, ঐক্যের পথে বাধা। পর্বতাঞ্চলের আঞ্চলিক ও স্থানীয় রাজনীতিকে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির অঙ্গিভূত করা না গেলে, বিচ্ছিন্নতার সন্দেহ আর অবিশ্বাস দুরীভূত হবে না, যে সন্দেহ অবিশ্বাস জাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ করে রেখেছে। তা থেকেই বিদগ্ধ পক্ষ ভাবছেনঃ ক্ষমতায় গেলে তারা এই একপেশে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন।

পার্বত্য বিধি ব্যবস্থাকে জাতীয়ভাবে গ্রহণীয় আইনীরূপ প্রদান দরকার। যদি পরিষদীয় কাঠামোটি সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, ও সার্বজনীন হয়, আর এটি হয় জাতীয়ভাবে গ্রহণীয় একটি মডেল, তখন সন্দেহ অবিশ্বাস ও নেতিবাচক চিন্তা চেতনা বিদুরিত হবে। ব্যবস্থাটির স্থায়িত্বের জন্য, এরূপ উদার পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। আর এ উদ্যোগটি উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আসাই উপযোগী। কারণ অন্যরা সন্দেহে আক্রান্ত।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অভিযোগ আর অসন্তোষের মাত্রা কমান দরকার। তারা এখন সরকারী আনুকুল্য স্নাত বরপুত্র। যারা তাদের ক্ষমতাসীন করেছেন, এবং বালা মুছিবত থেকে বাঁচিয়ে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখছেন, প্রতিনিয়ত তাদের দোষারোপ ও গঞ্জনা দান

অসঙ্গত। অলিখিত চুক্তির নামে বাঙ্গালী প্রত্যাহার সেনা ক্যাম্প সীমিত করণ, ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রথাগত ভূমি মালিকানা, জেলা প্রশাসকদের নির্বাহী ক্ষমতার সংকোচন, বাঙ্গালীদের দখল ও অধিকার থেকে জমিজমা মুক্তকরণ, চীফদের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দান, চাকুরী ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে অগ্রাধিকার ইত্যাদি দাবী অবাঞ্ছিত। এগুলো ঐক্য, সদিচ্ছা ও সাফল্যের পথে বাঁধা।

পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি শৃংখলা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় সেনাবাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ থাকা অপরিহার্য। এখনো স্থানীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কটি উত্তপ্ত। এখনো শান্তি চুক্তি বিরোধী একদল উপজাতীয় নব্য বিদ্রোহী মারমুখী। বহির্দেশীয় অনেক সশস্ত্র বিদ্রোহী সীমান্তের পাহাড়ে জঙ্গলে গোপনে ঘাঁটি গেড়েছে ও উৎপাতে লিপ্ত। জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর অস্ত্র মুক্ত সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনাযাপনে হুমকির সম্মুখীন। পুলিশ বিডিআর আনছার ইত্যাদি শান্তি রক্ষী বাহিনীগুলোর শক্তি ও সামর্থ, বিপদ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। দুর্গম অঞ্চলকে জেলা সদর থেকে তৎক্ষণাত নিয়ন্ত্রণ করা ও অসম্ভব। সুতরাং শান্তি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে সর্বত্র সেনা বাহিনীর নিয়োজিত থাকা এখনো জরুরী।

উপজাতীয়দের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা বনাম প্রকৃত তথ্য উপাত্ত।

(ক) উপজাতিদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দীর্ঘ পোষিত একটি বিষয়। সরকার প্রদত্ত শতাব্দী প্রাচীন সুযোগ-সুবিধা ভোগের ঐতিহ্যই তাদের উচ্চাভিলাষ পোষণের জন্য দায়ী। যদিও তখন সাধারণ লোক শ্রম দান ও দাসত্বে বাধ্য ছিলো, এবং কতিপয় সর্দার ও মাতবরই মাত্র শাসন ক্ষমতা ও আভিজাত্য ভোগ করেছেন। তবু ওটা উপজাতীয় আধিপত্য বলেই তাদের কাছে প্রতিভাত। জুতা পায়ে দেয়া, অলংকার পরা, পাকা বাড়ী-ঘর তৈরি, উচ্চ শিক্ষা লাভ, উন্নত আসবাবপত্র ব্যবহার, শিকারে প্রাপ্ত প্রাণীর নিরঙ্কুশ ভোগ ইত্যাদি অবাধ ছিলো না, তজ্জন্য নজরানা দিতে হতো। অভিজাতদের বিবাহে উৎসবে মদ, খাদ্য-শস্য, ও চাঁদা দান ইত্যাদি, সামাজিক বাধ্যবাধকতা, সাধারণেন জন্য পালনীয়, আর বিচার কাজে আরোপিত ফিস ও জরিমানা সর্দার মাতবরদের প্রাপ্য ছিলো। সামাজিক প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানে কর্তৃত্বের অধিকারে, অভিজাতেরা সাধারণের উপর দাসত্ব চাপিয়ে দিতেন। তাদের উক্ত আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাদিতে সরকার হতেন নিরপেক্ষ। অথচ এ সব আচরণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিপন্থী বিধায়, নিষিদ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উপজাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা দাবী নামায় এসব দাসত্বমূলক প্রথা ও অভ্যাসকে চর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আধুনিক যুক্তিবাদীদের পক্ষে এসব সমর্থনযোগ্য নয়। সামন্তবাদী ও দাসত্ব মূলক প্রথা ঐতিহ্য, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পোষণযোগ্য নয়। তাতে উচ্চ নীচ মর্যাদার চর্চা হয়। ঐতিহ্য হিসাবে অতীত কর্মকান্ড আকর্ষণীয় হলেও তখনকার সব আচরণ এখনকার যুগোপযোগী নয়। সম্প্রতি সমিতির অস্ত্র বিরতি ঘোষণায় একটি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে তা সংশোধিত হওয়া উচিত। বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

'সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার, কার্পাস চুক্তি ভঙ্গ করে, ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয় এবং স্বাধীন রাজার শাসন খর্ব করে দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দেয়'
(সূত্র ঃ অস্ত্র বিরতি ঘোষণা পৃঃ ১ তাং ১-৮-৯২)
এই বক্তব্যটির সাথে নিম্নোক্ত ধারণাগুলো জড়িত যথা ঃ
১। বৃটিশ পূর্বকালে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার বলে উপজাতীয় পক্ষ মোগলদের সাথে একটি কার্পাস চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

২। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি, সেই স্বাধীন সার্বভৌম উপজাতীয় রাজ্য দখল করে, তা ১৮৬০ সালে বৃটিশ ভারতের অঙ্গিভূত করে।
৩। ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো উপজাতীয় রাজাদের অধীন স্বাধীন উপজাতীয় রাজ্য।
৪। উপজাতিরা জুমিয়া জাতিত্বের পৃথক পরিচিতির অধিকারী।

এখন দেখতে হবে এ ধারণাগুলো কি সঠিক? নেহাত অপ্রিয় হলেও বিতর্কটি অপরিহার্য। সত্য তথ্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনিচ্ছা সত্বেও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দান আবশ্যক। উপজাতীয় আন্দোলনের যৌক্তিক শক্তি ও দুর্বলতা বুঝার পক্ষেও এটা যাচাই করা জরুরী।

প্রথম ধারণাটি একটি অতি উৎসাহী কিংবদন্তিমূলক বক্তব্যের অংশ। রাজা ভুবন বাবু সহ বিভিন্ন উপজাতীয় পন্ডিত এ ধারণাটির উপস্থাপক, এবং এটাই জনসংহতি সমিতির এতদ সংক্রান্ত দাবির ভিত্তি। উপজাতীয় পন্ডিতদের একদল মনে করেন, জনৈক চাকমা রাজা ফতেহ খাঁ, মোগল সম্রাট ফররুখশিয়ার ও মোহাম্মদ শাহের সাথে একটি তুলা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। আরেক দলের দাবী হলো ঃ চাকমা রাজা জুবাল খাঁ ওরফে জালাল খাঁ, চট্টগ্রামের মোগল শাসক মীর হাদির সাথে ঐ চুক্তিতে উপনীত হোন। তুলা চুক্তির দাবীদার ঐ দুই পক্ষের কেউই সুত্র হিসাবে কোন সনদ বা চুক্তিপত্রের কোন নকল উপস্থাপন করেন নি। অথচ মোগল কর্তৃপক্ষ সকল বন্দোবস্তি ও ফরমান, লিখিত দলিল বা সনদ আকারে সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের তা সরবরাহের নীতিতে যত্নশীল হতেন। এখনো সে আমলের খান্দানী পরিবারদের হাতে অনুরূপ প্রত্ন নিদর্শন গৌরবের স্মারক হিসেবে রক্ষিত আছে। তুলা চুক্তির ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হওয়া সন্দেহজনক। তদুপরি প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী পণ্যের পরিমান তুচ্ছ ১১ মনে সীমাবদ্ধ, যা ভারত সম্রাট মোগলদের পক্ষে চুক্তিযোগ্য বলে স্বীকার্য্য নয়।

চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত সীলমোহরের তালিকায় রাজা ফতেহ খাঁর সীল মোহরটিও আছে। আরবী বর্ণে খোদাইকৃত ঐ সীলমোহরের ভাষ্য অনুযায়ী তার কার্যকাল ১৭৭১ খ্রীঃ সালে শুরু। মোগল আমলের ইতিহাস বলে, মোগল রাজ পুত্র ফররুখশিয়ার ১৭১৩ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত সুবে বাংলার রাজমহলে রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। তার দাদা ভারত সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে, সিংহাসন দখলের পারিবারিক কলহের এক পর্যায়ে যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি রাজধানী দিল্লী দখল করেন, এবং সম্রাট ঘোষিত হোন। ১৭১৯ খ্রীঃ সালে বিষ প্রয়োগে তিনি নিহত হলে, তদীয় পিতৃব্য পুত্র মোহাম্মদ শাহ রাজপদ লাভ করেন। সুতরাং বৃটিশ আমলের লোক ফতেহ খাঁর পক্ষে, ঐ মোগল সম্রাটদের সাক্ষাৎ লাভ সম্পুর্ণ অসম্ভব।

বর্ণিত ফহেত খাঁ সম্বন্ধে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো ঃ চাকমা-রাজ-কিংবদন্তিতে তাকে ঐ বংশেরই শের মস্ত খাঁ, রহমত খাঁ ও শের জান খাঁর পিতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে তিনি রাজা জুবাল খাঁ ওরফে জালাল খাঁর স্থলাভিষিক্ত

পরবর্তী চাকমা রাজা। অথচ প্রখ্যাত পন্ডিত ও ঐতিহাসিক ডঃ এ, এম, সিরাজুদ্দিন স্বীয় গবেষণা প্রবন্ধ 'অরিজিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস' এ অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন, দক্ষিণ চট্টগ্রাম সীমান্তের পৃথক সামন্ত পরিবার চন্দন খাঁ বংশের শেষ ব্যক্তি ছিলেন ঐ জালাল খাঁ। তার কার্যকাল গুলো ১৭১৫-২৪ খ্রীঃ এই দশ বছর। অবাধ্যতার কারণে তিনি দোহাজারীতে নিযুক্ত মোগল সেনা নায়ক কৃষণ চাঁদ কর্তৃক বিতাড়িত হোন, এবং আরাকানে মৃত্যুবরণ করেন। এর ১৩ বছর পর ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে আরেক স্বদেশ ত্যাগী আরাকানী অভিজাত, যাকে শের মস্ত খাঁ ও আদি চাকমা রাজা বলে অভিহিত করা হয়, কিছু সঙ্গী সাথীসহ আরাকান ছেড়ে চট্টগ্রামে আসেন ও তথাকার মোগল শাসক জুলকদর খানের আনুকূল্যে কোদালা উপত্যকায় কিছু পতিত খাস পাহাড়ী জমি বন্দোবস্ত ও পূর্বাঞ্চলবাসী পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুম খাজনা আদায়ের তহসিলদারী লাভ করেন। সুতরাং ৩৪ বছরের পরবর্তী অর্বাচীন ফতেহ খাঁর পক্ষে, ঐ শের মস্ত খাঁর পিতা, আর তিনি চন্দন খাঁ বংশের সাথে ঐ শের মস্ত খাঁর বংশের সম্পর্ক রচনার যোগসুত্র হওয়ার দাবী করা, সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। সীল মোহর অনুযায়ী ফহেতো খাঁ হলেন শের মস্ত খাঁর স্ববংশীয় ৪র্থ অধঃস্তন পুরুষ। রাজ কিংবদন্তি অনুযায়ী সাথুয়া রাজার পুত্র চানান খাঁ ও রতন খাঁ, এবং রাজা মোগল্যার পুত্র জুবাল খাঁ ও ফতেহ খাঁ, অথচ অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন প্রদত্ত তথ্য মতে চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ পরস্পর সম্পর্কে পিতা পুত্র। রতন খাঁর পুত্র কাট্যুয়াই জালাল খাঁর পিতা। প্রামাণ্য সুত্রে ফতেহ খাঁ হলেন শের জব্বার খাঁর পুত্র, এবং শের জব্বার খাঁ শের মস্ত খাঁর জ্ঞাতি ভাই। এই সুত্রে কথিত সহোদর ভাই হিসেবে ফতেহ খাঁর পক্ষে ৪৭ বছর পরে জালাল খাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া সমর্থিত হয় না। এই অসঙ্গতিগুলো আলোচ্য ধারণাটির বিভ্রান্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তদুপরি অতিরিক্ত একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়ঃ মুসলিম নাম ও খেতাবে পরিচিত ঐ অভিজাতদের অমুসলিম চাকমা হওয়া কি নিশ্চিত? এর অনুকূলে কোন প্রমাণ উত্থাপন যোগ্য নয়। শুধু রূপ কথা আর ভাবাবেগই ইতিহাস নয়। যদি বলা হয়, তারা প্রকৃতই মুসলমান ছিলেন এবং চাকমারা ছিলেন তাদের প্রজা, তাহলেও কোন যৌক্তিক জবাব পাওয়া কঠিন হবে। এই প্রশ্নে কোন কোন উপজাতীয় মহলের চিরাচরিত জবাব হলো ঃ ঐ মুসলিম নামকরণ প্রাচীন আমলের মুসলিম সমাজ ও শাহী প্রভাবেরই ফল। কিন্তু এরও জবাব হলো ঃ মুসলিম প্রভাবিত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আমল দীর্ঘ হলেও তাতে এর ব্যতিক্রমই হচ্ছে। অধিকন্তু চন্দন খাঁ বংশের সময়কাল ১৭১১-২৪ এই তের বছর অবশ্যই মুসলিম প্রভাবিত আমল, কিন্তু তাদের চাকমা রাজবংশভুক্ত হওয়া প্রমাণিত নয়। আদি চাকমা রাজা শের মস্ত খাঁ সোনা বি ও শের জব্বার খাঁ সহ তিন পুরুষই মাত্র মোগল আমলের লোক, যাদের সময়কাল ১৭৩৭-৬৫ এই ২৮ বছর কাল দীর্ঘ। কিন্তু তাদের জন্মস্থান ও আদি বাসস্থান হলো আরাকানের রোসাং। এটা চাকমা লোকগীতি ও শের জব্বার খাঁর সীল মোহরের দ্বারা প্রমাণিত। এমতাবস্থায় তাদের শৈশবের নাম করণের স্থান আরাকান মুসলিম রাজকীয় প্রভাবমুক্ত ছিলো

বলেই ভাবা যায়। পরবর্তী সাতজন রাজার মুসলিম নামকরণে সে প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য নয়। তারা বৃটিশ আমলের লোক। হতে পারে তারা আরাকানী অভিজাত ঐতিহ্য মতে, অথবা মুসলিম হওয়ার কারণে, মুসলিম নাম ও খেতাবে অভিহিত হয়েছিলেন।

বাদশাহী আমলের প্রতিষ্ঠিত রীতি মোতাবেক মুসলিম সম্ভ্রান্ত লোকদেরই খান, খান সাহেব, খান বাহাদুর ও নবাব খেতাব প্রাপ্য ছিলো। কদাচিত অমুসলিম শাহী আত্মীয়দের ঐ খেতাবে ভূষিত করা হতো। তৎসঙ্গে অমুসলিম সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত ছিলো রায়, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, রাজা, রাজা সাহেব, রাজা বাহাদুর ও মহারাজ খেতাবগুলো। কদাচিৎ কোন মুসলিম অভিজাত স্বীয় অমুসলিম পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যের অনুসরণে রাজা ইত্যাদি সম্বোধিত হতেন। এই খেতাবের বিচারেও চাকমা রাজ পুরুষেরা অমুসলিম বিবেচিত হন না। এর অনুকূলে আরো বিবেচ্য হলো এখনো রাজ মহিষীদের বিবি, আর রাজাদের হুজুর সম্বোধন করা এবং তাদের খাটি মোগলাই সাজ পোষাক ও আড়ম্বর অনুসরণ যা বাংলা অঞ্চলে আচরিত অমুসলিম রীতি নয়। সর্বোপরি বিস্ময়করভাবে চাকমা ভাষা ও আচার আচরণের বৃহদাংশ খাঁটি মুসলিম চরিত্র সম্পন্নও বটে। এটা এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয় যে, একদা একদল চাকমা, ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং চাকমা রাজারাও ছিলেন মুসলমান। তুলাচুক্তি রাজা ভুবন বাবু কল্পিত গল্প এবং রাজ বংশ তালিকাটিও অধিকাংশে আজগোবী।

দ্বিতীয় ধারণাটি মনগড়া ইতিহাস প্রসূত। এর অনুকূলে উপজাতীয় পক্ষ কোন গ্রহণযোগ্য তথ্য উপস্থাপনে কখনো সক্ষম হবেন তা বলা যায় না। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হলো ঃ নবাব মীর কাসিম আলী খাঁন ১৭৬০ খ্রীঃ সালে এক ফরমান বলে, এ দেশীয় প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের দায়িত্ব বৃটিশদের নিকট অর্পণ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের শেষ মোগল শাসক রেজা খান, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি মিঃ হেরি ভেরেলস্টের নিকট ১৭৬১ সালের ৫ই জানুয়ারী এই এলাকার দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। ভেরেলস্টের ফরমান অনুসারে, তখন চট্টগ্রামের সীমানা ছিলো ঃ উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফনদী ও পুর্বে ঠেকা নদী হয়ে চীন পাহাড় শ্রেণী। পার্বত্য চট্টগ্রাম নামীয় কোন পৃথক ভূভাগ তখন ছিলো না। কুকি ও পুর্বের মুক্তাঞ্চলবাসী অরাজক উপজাতিদের উৎপাত ও আক্রমণ ঠেকাবার প্রয়োজনেই রেইড অফ ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবস নামীয় ২২ নং প্রশাসনিক আদেশের আওতায়, ১৮৬০ খ্রীঃ সালে এতদাঞ্চলকে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করা হয়। সুতরাং এটা সঠিক তথ্য নয় যে, ১৮৬০ খ্রীঃ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব ছিলো, এবং তা ছিলো, বৃটিশ প্রশাসনের বহির্ভুত মুক্তাঞ্চল, বা স্বাধীন চাকমা রাজ্য।

তৃতীয় ধারণাটি তথ্যের বিচারে সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন। এতদাঞ্চলে কোন উপজাতীয়

স্বাধীন রাজা ও রাজত্বের অস্তিত্ব থাকা, সমসাময়িক ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত নয়। ঐ রাজ্যের নিজস্ব ইতিহাসটিও প্রদর্শনযোগ্য নয়। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা আরাকান, মোগল ও পাঠান শক্তির সাথে, তাদের কোন সংঘাত সংঘর্ষ বা সম্পর্কের কথাও কোন বিবরণে প্রাপ্তব্য নয়। নিজস্ব মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ, কীর্তি, সনদ, রাজকীয় প্রত্ন-বস্তু বা দলিল জাতীয় কিছুও প্রদর্শন যোগ্য নয়। সুতরাং স্বাধীন রাজা, রাজ্য ও রাজত্ব থাকার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? রূপকথার কল্পকাহিনীভুক্ত রাজা রাজ্য রাজত্বকে বাস্তবে প্রমাণ করা কঠিন। উপজাতীয় পন্ডিত মহল বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় কিছু বক্তব্যকে খন্ডিতভাবে অবলম্বন করে আছেন। আসলে ঐ বক্তব্যগুলোর সুবিধাজনক অংশগুলো আংশিক উদ্ধৃতির মাধ্যমে তারা নিজেদের দাবীকৃত কল্পরাজ্যকে, সপ্রমাণে সচেষ্ট। কিন্তু ঐ বক্তব্যগুলো সামগ্রিকভাবে আত্ম বিশ্লেষিত যা নেতিবাচক তথ্যই দান করে। ভুল ভাঙ্গার জন্য ঐ বক্তব্যগুলো পরপর ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত হলো, যথা ঃ

1. The Rajas of the Chittagong Hll Tracts were originally appointed by the suffrage of the Jhoomias, Kukees and other inhabitants and not by the sovereign of the country as usual. They were all independently paid no tribute or revenue to the Moghal Government until the Moghee year 1077 ms 1715 AD.
(Ref : Revenue letter no 1499, Dated 10th September 1866 Addressed to the Commissioner Chittagong Division)

বাংলা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা স্বাভাবিকভাবে দেশীয় কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নয়, মূলতঃ জুমিয়া কুকি ও অন্যান্য অধিবাসীদের দ্বারাই নিযুক্ত। তাদের কেউই ১০৭৭ মঘী সন মোতাবেক ১৭১৫ খ্রীঃ সালের আগে স্বেচ্ছায় মোগল সরকারকে কোন রকম উপঢৌকন বা কর দিতেন না। (সূত্র চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারকে লিখিত রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খ্রীঃ)

এ বক্তব্যের তাৎপর্য এটাই হওয়া সম্ভব যে, তাদের স্থানীয় স্থায়ী নাগরিকত্ব, ক্ষমতা ও ভূস্বাধিকারের প্রতি মোগল সরকারের অনুমোদন বা স্বীকৃতি ছিলো না। বাস্তবে তারা ছিলেন ভূমিহীন যাযাবর জুমিয়া। চন্দন খাঁ বংশীয় শেষ সামন্ত জালাল খাঁই ১৭১৫ খ্রীঃ সালে মোগল সরকারকে কর দানের দ্বারা আনুগত্য স্বীকার করেন। এলাকাটিও ছিলো মাতামুহুরী নদী উৎসের বার্মা সীমান্তে, অবস্থিত ছোট্ট এক ভূভাগ, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। যে ক্ষুদ্র এলাকাটি চন্দন খাঁ বংশের দখলাধীন ছিলো তা বার্মা ও মোগল শাসিত অঞ্চলের মধ্যাঞ্চল। চন্দন খাঁ বংশের অমুসলিম উপজাতীয় হওয়াটাও সন্দেহজনক। তাদের কার্যকাল ছিলো মাত্র ১৩ বছর দীর্ঘ।

2. In 1763 Ac Verelst the English Chief of Chittagong and his Council by proclamation declared the local jurisdicton of the Raja to be all the hills from phani river to sungu and from Nijampur Road to hills of kukee Raja, (Ref : Chittagong Hill Tracts Gazetteer by KHS Hutchinson page, 24)

বাংলা ঃ ১৭৬৩ সালে চট্টগ্রামের ইংলিশ প্রধান ভেরেলস্ট ও তার পরিষদ, ফরমান জারি করে ঘোষণা করেন যে, রাজার (শের মস্ত খাঁর) স্থানীয় এখতিয়ার হবে, ফেনী নদী থেকে শঙ্খ এবং নিজামপুর সড়ক থেকে কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত সমূদয় পর্বতাঞ্চল।
(সূত্র ঃ মিঃ কে এইচ এস হাচিনসনকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের গেজেটিয়ার পৃষ্ঠা ঃ ২৪)
এটা জুল কদর খাঁন প্রদত্ত তুলাকর বা জুম কর আদায় বা জুম নোয়াবাদ সংক্রান্ত ফরমান সুত্রে প্রাপ্ত তহসিলদারী, ভূমিস্বত্ব নয়।

৩। Mr. Hary Verelst Chief of the Chittagog Council of the period declared that it 'had been proved to his satisfection that, all the hills from phanny to the sungoo and from the Nijampur Road to the hills of the Kukee Rajah pertained to the Zamindery of Raja Sher Most Khan, in the Kapas Mohal Depertment, and directed that he should continue in possas-sion there of paying the revenues of the Government and prohibited sub-ordinate officers from interfering with him, his heirs and successors in this holding,

(Ref : Letter to Kalindi Rani by Mr. A smith the Collector of Chittagong, dated the 2nd January 1866)

বাংলা ঃ মিঃ হেরি ভেরেলষ্ট তখনকার চট্টগ্রাম পরিষদের প্রধান ঘোষণা করেন, এটা তার কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত যে, ফেনী থেকে শঙ্খ এবং নিজামপুর সড়ক থেকে কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত সমূদয় পর্বতাঞ্চল, যা কার্পাস মহাল নামীয় বিভাগের অধীন, তা রাজা শের মস্ত খাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আদেশ করেন যে, সরকারের প্রাপ্য খাজনা পরিশোধ করার দ্বারা তাতে তিনি অব্যাহতভাবে অধিকারী থাকবেন এবং সব অধঃস্তন কর্মকর্তাদের, তার উপর তার ওয়ারিশান ও উত্তরাধিকারীদের উপর উক্ত স্বত্বের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকেও তিনি বারণ করেণ (সুত্র ঃ চট্টগ্রামের কালেক্টর মিঃ এ স্মিত কর্তৃক কালিন্দি রাণীর নিকট লিখিত চিঠি তাং-২রা জানুয়ারী ১৮৬৬)।

এই চিঠিতে বর্ণিত জমিদারীর অর্থ জুম নোয়াবাদ বা জুম তহসিলদারী, যা চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুল কদর খান কর্তৃক রাজা শের মস্ত খানকে প্রদত্ত হয়েছিলো। বাস্তবে মিঃ ভেরেলস্টের সময় শের মস্ত খান জীবিত ছিলেন না। এবং তার বন্দোবস্তি তরফে শুকদেব ছিলো কোদালায় সীমাবদ্ধ।

৪। In 1829 Mr. Halhead the Comissioner stated that, the hill tribes were not british subjects, but merely, tributories, and that we recognised, no right, on our part to interfere with their internal arrangement. (Ref : Statistical Account of Bangal Vol vi, page 22 by w. w. Hunter,
বাংলা ঃ ১৮২৯ সালে কমিশনার মিঃ হলহেড বলেন, পাহাড়ী উপজাতিরা বৃটিশ প্রজা নয়, বড়জোর নজরানা বা কর দাতা। এ কারণে আমাদের পক্ষে তাদের আভ্যন্তরিন ব্যবস্থাদিতে হস্তক্ষেপ করা অনুমোদনীয় নয়।
(সুত্র ঃ ষ্টেটিষ্টিকেল একাউন্ট অফ বেঙ্গল, খন্ড ৬ পৃষ্ঠ ২২ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার)।

এই বক্তব্যটির সাথে ভিন্ন তথ্য জ্ঞাতব্য। উপজাতিরা ছিলো বহিরাগত, ভ্রাম্যমান জুম চাষী। পার্বত্য চট্টগ্রাম তখন আরাকানী উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ। বর্তমানের অধিকাংশ উপজাতি সেই তাদেরই রংশধর। তখনো ১/১৯০০ সালের আইনের আওতাধীন রচিত পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ ধারায় মঞ্জুরযোগ্য ইমিগ্রেশন বা অভিবাসনের আইনগত সুবিধা প্রচলিত ছিলো না। তাই এতদাঞ্চলীয় অধিকাংশ উপজাতি বিদেশী ও বিজাতি হিসাবে গণ্য ছিলো। স্থানীয় নাগরিক না হওয়ার দরুণ, তাদের বৃটিশ প্রজা না হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। তবে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়ে এই পার্বত্য অঞ্চলে অভ্যস্ত পেশা জুম চাষে তারা লিপ্ত হতো। যদ্দরুণ রাজস্ব নিয়মে তাদের পক্ষে কর দেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। ১৮২৪ খ্রীঃ সালের প্রথম বৃটিশ বার্মা যুদ্ধ, বৃটিশদের আরাকান দখল ইত্যাদি কার্যকারণ ও প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস পাঠে, এতদসংক্রান্ত বিষদ তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব। সুতরাং উপজাতীয় রাজা রাজ্য বা রাজত্বের কথা বাস্তবে একটি আত্ম ভুলানো রূপকথা।

ভারতে বৃটিশ দখল সম্প্রসারণ ও তাদের দীর্ঘ শাসনের ইতিহাস সবিস্তারে লিখিত আছে। তাদের হাতে অতীতে কখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র উপজাতীয় রাজ্যের পতনের কথা কোন বিবরণেই প্রাপ্তব্য নয়। বৃটিশ ভারতের ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্যের তালিকায় এরূপ কোন রাজ্যের নাম অন্তর্ভুক্ত নেই। গোটা পূর্বাঞ্চল জুড়ে কুচবিহার, মনিপুর আর ত্রিপুরাই ছিলো, স্বীকৃত দেশীয় রাজ্য। অবশ্য ১৭৭৬-৮৬ এই দশ বছর স্থায়ী একটি চাকমা বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়া সরকারী রেকর্ডপত্রে স্বীকৃত। তখন বিদ্রোহী পক্ষ নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিপক্ষ রূপে ঘোষণা করেননি। বিদ্রোহী চাকমা রাজা জান বখশ খাঁ, স্বীয় সীল মোহরে নিজেকে

মহারাজ তথা সামন্ত অধিপতি দাবী করেছেন। শুক দেবও লোকগীতি মতে জমিদার ছিলেন। রাণী কালিন্দিও নিজের জমিদার দাবীতে সোচ্চার ছিলেন, যা কার্যতঃ বৃটিশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। খোদ কালিন্দি রাণী রাজা নগরের পরিত্যক্ত রাজবাড়ীর বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে লিখিত ভাবে স্বীকার করেছেন ঃ চাকমাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শের মস্ত খাঁ। চাকমা লোকগীতি অনুযায়ী যার আদি বাসস্থান আরাকানের রোয়াং বা রোসাং। নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তার আগমন কাল হলো ১৭৩৭ সাল। রাজা শের জব্বার খাঁর সীল মোহরের ভাষ্য অনুযায়ী তিনিও স্বীয় সর্দারী কালে (১৭৪৯-৬৫) আরাকানের রোসাংবাসী ছিলেন। সুতরাং বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত চাকমাদের মূল অংশের জাতিগতভাবে আরাকানে থাকাই সমর্থিত হয়। শের মস্ত খাঁর মাধ্যমে তাদের কিছু লোকের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ ছাড়া, রাজ্য শক্তির অধিকারী হওয়া, আজগুবী তথ্য। এদের সবাই রাজা অভিহিত সর্দার। তবু উপরোক্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় উক্তিগুলো স্বাধীনতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, যা বাস্তবে ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক। বৃটিশ শাসন আরম্ভকালের সেই ১৭৭৬-৮৬ সালের বিদ্রোহটি ছিলো আসলে ভারতব্যাপী বৃটিশ বিরোধিতার অংশ। বাংলায় তখন ফকির ও সন্যাসীদের বিদ্রোহ চলমান। ঘটনার সুত্রে জানা যায়, চাকমা বিদ্রোহের সাথে একদল কুকি এবং জনৈক মুন গাজির নেতৃত্বে একদল বাঙ্গালীও যুক্ত ছিলেন। সুতরাং তা চাকমা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হওয়া সন্দেহজনক। তবে বাস্তবে পাওয়া না গেলেও, কল্প কাহিনীতে চাকমা রাজ্য ও রাজত্ব বিদ্যমান। রাধা মোহন ধনপতি গীতিমালাটি সে কাহিনীর যোগানদার। কার্যতঃ এটিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দান্যাওয়াদি আরেদ ফুং নামের হুবহু আরেকটি কাহিনী মঘী ভাষায় আরাকানেও প্রচলিত আছে। ভাষাতত্বের বিচারে দান্যাওয়াদি আরেদ ফুং হলো ধনপতি বা ধনবতী রাধা মোহনের আরাকানী ভাষ্য। পার্থক্য শুধু নামশব্দ প্রয়োগের মাঝেই সীমাবদ্ধ। চাকমা কাহিনীতে রাধা মোহন শব্দ আগে স্থান পেয়েছে, আর আরাকানী কাহিনীতে পরে। মৌলিকত্বের বিচারে কোনটি আসল আর কোনটি নকল, নির্ধারণ করাও মুশকিল। মনে হয় কাহিনীটি অতিরঞ্জণ ও বাস্তবতা মিশ্রিত। তাতে অনুমান করা যায়, সুদূর অতীতে একদা কোথাও চাকমা সম্প্রদায়ের কিছু সামন্তীয় আধিপত্য ছিলো। কাহিনীটি তারই স্মৃতি কথা। এসি বেরেলস্টের বক্তব্যই প্রমাণঃ তিনি ছিলেন জমিদার, স্বাধীন রাজা নন। ঐ কথিত জমিদারীটাও ছিলো সরকারী তুলা মহালের অধীন জমি। তার মানে জুমিয়ারা তুলা সরবরাহের অঙ্গীকারে এক সনা বন্দোবস্ত নোওয়াবাদের আওতায় খাস তুলা মহালে জুম চাষ করতো। তুলা চাষাধীন ঐ জুম ক্ষেত্র কাপাস মহাল নামেও অভিহিত ছিলো। ঐ জুমিয়াদের কাছ থেকে নগদে বা তুলার আকারে জুম কর আদায় পরিশোধে শের মস্ত খান সরবরাহকার রূপে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন।

মোগল আমল ও বৃটিশ আমলের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক উপাদান এবং কর্তৃপক্ষীয় বক্তব্যের বিশদ ও সামগ্রিক বিবরণের দ্বারা, অকাট্যভাবে এটা প্রমাণিত যে, অতীতে চাকমা বা অন্য কোন উপজাতির পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও, কোন স্বাধীন রাজ্য বা রাজত্ব ছিলো না। এতদাঞ্চলে চাকমা অভিবাসনের প্রথম অনুমোদনদাতা ব্যক্তি হলেন চট্টগ্রামের মোগল নায়েব জুলকদর খান, যিনি শের মস্ত খাঁকে জমি বন্দোবস্তি ও জুম খাজনার তহসিলদারী মঞ্জুর করেছিলেন। তবে সার্বভৌম রাজ্য ও রাজত্বের অধিকারী না হলেও, তিন উপজাতীয় রাজ পরিবার ঈর্ষণীয় প্রাচীন কৌলিন্যের অধিকারী, এবং তাদের সম্প্রদায়গুলো গৌরবজনক অতীত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। শুধু বাংলাদেশেই তাদের কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন কৌলিন্য বিদ্যমান। এটা অত্যন্ত গৌরবজনক উত্তরাধিকার।

উপজাতি পক্ষের চতুর্থ বা শেষ ধারণাটি ও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসুত। উপজাতীয় বা জুমিয়া জাতিত্বের অস্তিত্ব এতদাঞ্চলে কখনো ছিলো না। তাদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যা, জনসংহতি সমিতির হিসাব অনুযায়ী দশ ভাষাভাষী তেরো একথা ঠিক নয়। স্থানীয় সরকার পরিষদের স্বীকৃতি মূলে তা পনের, বিদেশী নৃতাত্ত্বিক পন্ডিতদের হিসাব মতে দশের অধিক এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমষ্টিগতভাবে সাত ও সম্প্রদায়গতভাবে তেইশ। এই বিভিন্নতা সহ নিজস্ব আশা-আকাঙ্খা, ভাষা আচার-আচরণেও সবাই ভিন্ন। বাঙলা ভাষাই তাদের পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম। অবশ্য একমাত্র জুম পেশাই তাদের ঐক্য ও অভিন্নতার সুত্র, যে পেশাটি আজকাল বিলীয়মান। এটা আদিমতার শেষ অবলম্বন। উপজাতিদের সবাই এই পেশায় জড়িত নেই। জুমিয়া পরিচয়টিও আধুনিক ভদ্র ও শিক্ষিত লোকদের রুচি ও মানের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। বাঙালীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হুজুগে পৃথক জাতি সত্তা জ্ঞাপনে এই অনুপযোগী সংজ্ঞাটির চর্চা হচ্ছে। উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, উপজাতীয় রাজনীতি দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা বাঙালীদের সাথে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত।

দেশে বাঙালীদের বাৎসরিক নব প্রজন্মের সংখ্যা কম হলেও পঁচিশ লক্ষ। উপজাতীয় অস্ত্রবাজি, রক্তপাত ও প্রাণহানিতেও তাদের এ সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।উপদ্রবের মাঝেও এতদাঞ্চলে তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে না। সুতরাং বাঙালী নিয়ন্ত্রণে আরোপিত অস্ত্রবাজি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখন সাফল্যের যে একমাত্র উপায়টি অবশিষ্ট আছে তা হলো : জাতীয় সদিচ্ছা ও সহানুভূতি লাভ ও উপজাতীয় বৈচিত্র্যকে বাঁচাবার আবেদন সৃষ্টি। সন্দেহ নেই, শেষমেশ শান্তির প্রতি জনসংহতি সমিতির আগ্রহ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সর্বোচ্চ আশার কথা যে, তারা দাবী-দাওয়ার পরিধি সংকুচিত করে এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভের মাঝেই তা সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন। উগ্রতা আর বাড়াবাড়ি আংশিক স্থগিত হয়েছে। এটা সদিচ্ছার প্রকাশ। এমতাবস্থায় ন্যায্য দাবী-দাওয়া এখন আর অপূরণীয় নয়।

খ) কী কারণে উপজাতিরা বিক্ষুব্ধ, আর কেনই বা তারা সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত, শান্তির স্বার্থে এখন তা খুঁজে দেখা দরকার। এই লক্ষ্যে প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, সূচিত আন্দোলনের ভিতরকার দর্শনটি কী? উপজাতিদের রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা দাবী নামায় তা নিম্নাকারে উপস্থাপন করেছেন, যথা ঃ

১। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম, লুসাই, মুরুং পাংখো, রিয়াং ও চাক এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। (সংক্ষিপ্ত)

২। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে রচিত প্রথম শাসনতন্ত্রে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক শাসিত অঞ্চলরূপে স্বীকৃত। পাকিস্তানের ১৯৬২ সালে রচিত দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে একদাঞ্চল উপজাতীয় অঞ্চলরূপে ঘোষিত। ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে ঐ দুই প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়েছে, যা জুমিয়া জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আর ভূমিস্বত্ব সংরক্ষণের পরিপন্থী। (সংক্ষিপ্ত)

৩। জুমিয়া জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের উপায় হলো ঃ গণতন্ত্র সম্মত স্বায়ত্তশাসন। দেশ রক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক মুদ্রা ও ভারি শিল্প ইত্যাদি বাদে অন্যান্য বিষয়াবলী হবে তার এখতিয়ারাধীন। এসব বিষয়ে তার আইন প্রণয়নেরও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে। বহিরাঞ্চলবাসীদের ভূমি ক্রয় বসতি স্থাপন ও বন্দোবস্তি গ্রহণ নিয়ন্ত্রিত হবে। ১৭ আগস্ট ১৭৪৭ এর পর থেকে এ যাবৎ আগত বহিরাগতদের প্রত্যাহার ও স্বদেশত্যাগী উপজাতীয়দের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগ ও বদলিতে স্থানীয় এখতিয়ার হবে নিরঙ্কুশ। বহিরাঞ্চলবাসীদের প্রবেশ ও বসবাস হবে অনুমতি সাপেক্ষ। পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম হবে জুম্মল্যান্ড।

এই ক্ষমতা ও ধারণাগুলো স্থানীয় শায়ত্তশাসন দাবীর ভিত্তি, আর এটা হলো উপজাতি পক্ষের মোটামুটি রাজনৈতিক দর্শন। এখন এর তথ্যভিত্তিক যথার্থতা ও বাস্তব পরিস্থিতি জাত পরিবেশ, যাচাই করা হলে, উভয় পক্ষের যুক্তিবাদীদের বিষয়টি বুঝতে ও তার ভুল ত্রুটি নিরূপণে সহায়তা হবে। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মীমাংসায় পৌছতে অনুরূপ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপন দরকার।

এটা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, উপরোল্লেখিত উপজাতিরা বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। কিন্তু এটা তাদের আদি জাতীয় আবাসভূমি নয়। জনসংহতি সমিতি এতদাঞ্চলকে উপজাতিদের আদি জাতীয় আবাসভূমি জ্ঞানে এখানে তাদের ভূমিস্বত্ব আর একাধিপত্য সংরক্ষণের দাবীদার। আসলে এটা তাদের ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের আগমন, নির্গমন চিহ্নিত আছে। এদের অধিকাংশই বহিরাগত জুমিয়া উদ্বাস্তুদের বংশধর। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারার সুবিধা বলে এরা তখন থেকে এতদাঞ্চলের অভিবাসী নাগরিক, মূল অধিবাসী নয়। সংখ্যায় ও তারা দশ নয় বেশী। বৃটিশ ও পাকিস্তান

আমলের শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য এখন আর বাধ্যতামূলক পালনীয় নয়। সে অপ্রয়োজনীয় আর অবাঞ্ছিত বিধি-বিধানগুলো নতুন আইনের দ্বারা বর্জিত হয়েছে। অর্জিত স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আর গণতন্ত্রের মানে তো যুগোপযোগী নিজস্ব ইচ্ছা আকাঙ্খা ও ক্ষমতার প্রয়োগ, পশ্চাদপদতাকে আঁকড়ে ধরা নয়। ১/১৯০০ সালের শাসন বিধি তথা পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইনে উপজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ, স্বশাসন ইত্যাদি কোন সুযোগ-সুবিধাই প্রদান করেনি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিলো ঔপনিবেশিক বিধি ব্যবস্থা। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রগুলো পূর্বাঞ্চলের আশা-আকাঙ্খা পূরণের উপযোগী ছিলো না। বাংলাদেশ সংবিধান রচনায় জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খোদ শরীক ছিলেন। তিনি তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তথা ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেননি। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তার দাবী উঠালেও জাতীয় পরিষদে এতদাঞ্চলের পৃথক শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ও উপজাতীয় স্বীকৃতি আদায়ের দাবীতে সোচ্চার ছিলেন না। এখন এ বিষয়গুলো সাংবিধানিক জটিলতায় আবদ্ধ। তার সহজ সমাধান নেই বা তা সময় সাপেক্ষ। যুক্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও আধুনিকতার বিচারে আসলে ১/১৯০০ সালের আইনের অধীন রচিত পার্বত্য শাসন বিধি একটি জংলী আইন। তিন উপজাতি প্রধান, তিনশত তেহাত্তর জন মৌজা প্রধান, ও শতাধিক বাজার চৌধুরীকে তা কুলিন, প্রশাসনের খয়ের খাঁ, ও একাধারে সাধারণ লোকের প্রভুতে পরিণত করেছে। সাধারণ লোক ঐ অভিজাত আর সরকারী কর্মকর্তাদের বেগার শ্রম দানেও বাধ্য। ঐ আইনের ৫১ ও ৫২ ধারা কার্যতঃ স্বদেশবাসী কারো আগমন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে না। অভিবাসন তথা বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ও বিতাড়নই তার লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক স্বার্থে বহিরাগত উপজাতিরা আনুকূল্য পেয়েছে। তাদের অভিবাসী হওয়ার পরিচয় তবু তাতেও ঘোচেনি বরং শীলমোহর পড়ে আরো শক্ত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ঐ বৃটিশ প্রবর্তিত ঐতিহ্যকে মেনে নিতে বাধ্য নন। তবুও কিছু ঐতিহ্য না ভাঙ্গার উদারতা প্রদর্শিত হয়েছে। ভূমিস্বত্ব না পাওয়ার জন্য উপজাতিদের জুম চাষ ও বন্দোবস্তি গ্রহণের অনীহাই দায়ী। এতদাঞ্চল কোন আইনেই উপজাতিদের লাখেরাজ সম্পত্তি নয়। কোন কর্তৃপক্ষই পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতিদের লাখেরাজ সম্পত্তি রূপে ফরমান জারি বা ঘোষণা দেননি। বিনা বন্দোবস্তিতে ভূমির মালিকানা লাভ বিধিবদ্ধ না থাকায়, সরকারী সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশের ভূমিস্বত্ব অর্জিত হয়নি। এর জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। এখন ভূমিস্বত্ব সংরক্ষণের দাবী অবান্তর। স্বাভাবিক নিয়মে বন্দোবস্তি গ্রহণ অবাধ। দখলীয় বা আবাদী জায়গা জমি খাস রেখে, মালিকানা প্রতিষ্ঠা বিধিসম্মত নয়। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীন শিক্ষিত ভদ্র লোকদের জুমিয়া পরিচয় মর্যাদা সম্পন্ন নয়। গণতন্ত্র কখনো পশ্চাদপদতা, আদিমতা, সংরক্ষণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠী প্রীতি ও কুপমন্ডুকতাকে সমর্থন করে না। গণতন্ত্র স্বাধীন উদার ও সার্বজনীন কল্যানের ধারণা। সংকীর্ণতা ও সুবিধাবাদ তাতে সমর্থিত নয়। সর্বোপরি গণতন্ত্র এখন সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গোটা জাতীয়

জনমত পুনরায় ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ধরনের স্বায়ত্তশাসন লাভের আকাংখা স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। তবে স্থানীয় বা আঞ্চলিক শাসনের প্রশ্নটি মীমাংসাযোগ্য। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় শাসন আইনের আওতায় রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিকল্প উদ্ভাবন করা সম্ভব।
বাঙালীদের বেআইনী বহিরাগত বলা, তাদের বৈধ সহায় সম্পত্তিকে আইনানুগ স্বীকার না করা, নির্বিচারে তাদের সবার প্রত্যাহার দাবী, পাকিস্তান আমলের স্বদেশত্যাগী উপজাতিদের প্রত্যাবাসন কামনা, ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তি ও আগমন নির্গমনে বাঙালীদের অধিকারের অস্বীকৃতি ইত্যাদি নিতান্তই উস্কানীমূলক বাড়াবাড়ি। তাতে যুক্তির চেয়ে হিংসাই মুখ্য। এর বিপরীতে বাঙালী প্রভাবিত গোটা জাতি, উপজাতিদের বৈরী ভাবতে পারে। প্রায় ভুলে যাওয়া বেআইনী উপজাতীয় বহিরাগমনের অনাকাংখিত অসন্তোষ পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠা সম্ভব। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উপজাতীয় অভিবাসন স্বীয় স্বার্থে মেনে নিলেও তা এই স্বাধীন জাতির জন্য অপরিহার্য নয়। বাঙালী বিরোধী দাবীর পাল্টা শ্লোগান উঠাও সম্ভব। তারাও বলতে পারে ঃ বাঙালীর আদি স্বদেশ বাংলার এই পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিরা মূল অধিবাসী নয়। একদা বিদেশী শক্তির মদদে অভিবাসিত। এই অভিবাসীদের দ্বারাই বাঙালীরা অন্যায়ভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এই দাবীর পিছনে অকাট্যভাবে ইতিহাস সাক্ষী। আজ বিদেশী মদদের বলে, শক্তিশালী উপজাতীয় গলাবাজি আর অস্ত্রের চাপে, বাঙালীসহ ক্ষুদ্র ও দুর্বল সম্প্রদায়গুলো স্তব্ধ আর জিম্মি। বিদ্রোহী বড় সম্প্রদায়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে বিপক্ষ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়দের অসহায় অবস্থায় পতিত হবার আশংকা করা যায়। সে পরিস্থিতিতে এখানে বাঙালী উপস্থিতি, ঐ দুর্বল ও ক্ষুদ্রদের রক্ষা কবচ রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

বাঙালীদের বিপরীতে উপজাতিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা। তাদের সম্মিলিত সংখ্যা প্রাধান্য একটি কাগুজী যোগফল মাত্র। বাস্তবে যোগসূত্রহীন কতিপয় স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যৌগিকভাবে বাঙালীদের বিপক্ষে সংখ্যাগুরু, পৃথক হিসাবে নয়। বাঙালীদের শক্তির ভিত্তি স্বদেশ স্বজাতি আর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতা। এর বিপরীতে উপজাতিরা বহু ক্ষুদ্র বিভক্তপক্ষ ও পরনির্ভর। উপজাতীয় বিদ্রোহ আর হিংসা, বাঙালীদের শক্তি বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। এখন তারা এতদাঞ্চলের একক প্রধান সম্প্রদায়ে পরিণত। এই বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

দেশ ব্যাপ্ত ভূমিহীনতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি অপ্রতিরোধ্য। বাড়তি জনসংখ্যার স্রোত কোন নিষেধাজ্ঞার প্রতিরোধেই সামালযোগ্য নয়। স্বদেশের ভিতর আন্তঃআঞ্চলিক পাসপোর্ট ও ভিসা প্রবর্তনের দাবী একটি অবাস্তব প্রস্তাব। এটা রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পরিপন্থী। এটা রাষ্ট্রের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অসদেচ্ছার প্রকাশ। জুম্ম ল্যান্ড নামের প্রস্তাব হুজুগী ও

সাতন্ত্রবাদী। এই নতুন পরিচয় লাভের চেষ্টা দুর্ভাগ্য জনক। এর বিপরীতে জুম বঙ্গ নাম অনেকটাই ঐতিহ্যানুগ। মুসলিম বাদশাহী আমলে সীমিত আকারে হলেও এ নামটির প্রচলন ছিলো। প্রাচীন বঙ্গ নাম ও জুম ঐতিহ্যের স্বীকৃতি তাতে আছে।

এখানে রাজা ফতেহ খাঁ সংক্রান্ত আরেকটি আজগুবী গল্প কথার প্রত্যুত্তর দেয়া দরকার। রাজা ভুবন মোহন রায়সহ অনেক চাকমা পন্ডিত দাবী করেন ঃ মোগলদের যুদ্ধে পরাজিত করে, কথিত ফতেহ খাঁ ও কালু খাঁ নামীয় কামানদ্বয় দখল করা হয়েছিলো। ফতেহ খাঁ নামীয় কামানটি এখনো রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। অথচ সঠিক তথ্য হলোঃ ফতেহ খাঁ বৃটিশ আমলেরই লোক। কামানগুলো সম্ভবতঃ প্রাচীনকালের পরিত্যক্ত অবস্থা থেকে সংগৃহীত। পরে তা গৌরব গাথার উপকরণে পরিণত হয়েছে। পূর্বের চাকমা সদর দপ্তর রাজভিলা শুক বিলাস ও রাজা নগরে এগুলো ছিলো না। কোন প্রাচীন বিবরণে এগুলোর কথা নেই। এই কাহিনীর রচয়িতা রাজা ভুবন মোহন রায়। তিনি রাঙ্গামাটির রাজবাড়ীকে পাকা দালানে পরিণত করেন এবং ফতেহ খাঁ নামীয় কামানটিও স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ এটি তার নিজের দ্বারা সংগৃহীত। এটি তার পারিবারিক কৌলিন্য ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধির পক্ষে সংযোজিত আরেক উপকরণ। ইংলিশে লেখা এর পরিচয়, প্রাচীনত্বের স্মারক নয়।

সংকটের ইতিবাচক ক্রমোন্নতি।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় গঠন কাঠামো সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ ঃ
'অনুচ্ছেদ ১। প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।'

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দেশটি বিশুদ্ধভাবে এককেন্দ্রিক। যুক্ত রাষ্ট্র বা মিশ্র ধরনের রাষ্ট্র গঠনের সামান্যতম সুযোগ এতে নেই, এবং কেন্দ্রই সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একক অধিকারী। অধঃস্তন কোন সরকারের এতে সংস্থান নেই।
এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিপরীতে জনসংহতি সমিতির মূল দাবি ছিলো ঃ
'১। ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা।

খ) নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।'
দাবীকৃত এই গঠন ব্যবস্থা সরাসরিভাবে সংবিধানে ব্যক্ত গঠন ব্যবস্থার বিরোধী। সুতরাং তা গ্রহণের বিধিগত বাধা দুর্লজ্ঘ্য। জনসংহতি সমিতি এই সর্বোচ্চ বিধিগত বাঁধাকে দীর্ঘ বিশ বছরের রক্তক্ষরণের পর আমল দেয় এবং দাবি দাওয়াগুলোকে আইনগত বৈধতা দানের দ্বারা গ্রহণীয় করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের বাঁধা এড়াতে স্বীয় দাবীনামাটি নিম্নাকারে সংশোধন করে।
'১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা। খ) আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।'

দাবীনামার এই সংশোধনী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুকূলে গৃহীত বলে মনে হলেও, এটা চরিত্রগতভাবে পুরাপুরি এককেন্দ্রিক অখন্ড রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থক বক্তব্য সম্বলিত নয়। এতদাঞ্চল বাংলাদেশের কোন উপনিবেশ বা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত অঞ্চল বলে স্বীকৃত হলেই তবে পৃথক অঞ্চলের মর্যাদায় অবশিষ্ট বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রেখে, সংবিধানে এর স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বর্ণিত সংশোধনীর সংযোজন হতে পারে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি বা অন্য কারো দাবী এরূপ নয়। ঐতিহাসিকভাবে এতদাঞ্চল বাংলাদেশের দখলীয় বা সংযোজিত অঞ্চল নয়। সংশোধিত দাবীটিও সংবিধানের অনুকূল নয়। সংবিধান মান্যতা এই সংশোধনীর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকলে তা সরাসরি হতে হবে। তবে সুখের কথাঃ জনসংহতি সমিতির বর্ণিত সংশোধনী, আর সরকারের স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন নং ১৯, ২০ ও ২১/১৯৮৯ প্রণয়ন ও জারি, এবং তার ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলায় স্বতন্ত্র তিন স্থানীয় বা জেলা পরিষদ গঠন, এই দুই ব্যবস্থাই সমস্যার সমাধানকে সহজ করে তুলেছে। তাতে পার্বত্য সংকটের সমাধান এখন একটি গ্রহনীয় রূপ রেখায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। উভয়পক্ষ কিছু নমনীয় অবস্থান নিলেই, সংবিধানের বিধি নং ১ ও ৫৯ এর আওতায়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি বিধানের সুযোগ-

সুবিধাসহ, একটি মীমাংসা সমঝোতায় পৌছা সম্ভব। গণভোটে স্বায়ত্ত শাসন মূলক সাংবিধানিক সংশোধনী জনগণের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া অনিশ্চিত। সরকার ও জনসংহতি সমিতি একমত হলেও তা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এ যুক্তির ভিত্তিতে এখনই মেনে নেওয়া দরকার যে, দেশে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে জন সমর্থন ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। অঞ্চল বিশেষের স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুরের পক্ষে এই পরিবেশ অনুকূল নয়। পার্বত্য অঞ্চলের হিংসা ও রক্তপাত, দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে গণভোটে সমর্থন সাপেক্ষ সাংবিধানিক সংশোধনী আনয়ন দেশে মতবিরোধ ও অনৈক্যের সৃষ্টি করবে, যা উপজাতি বা দেশবাসী কারো স্বার্থের অনুকূল হবে না। বিশৃঙ্খলার আশংকা আর সমর্থনের অনিশ্চয়তাকে অবহেলা করা যায় না। একদা হয়তো গোটা জাতি যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে উঠবে। তখনকার জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবীটি মূলতবী রেখে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। শান্তিপুর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাতারাতি ও সশস্ত্রভাবে অর্জিত হয় না। সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণা গণতন্ত্র সম্মত নয়। আলোচনার মাধ্যমে মতানৈক্য দূর করা, সমঝোতায় পৌছা, ও গ্রহণ বর্জনের নীতি গ্রহণ ছাড়া, শান্তি অর্জিত হবে না। সশস্ত্র বিজয় অর্জনের আশাবাদ বাস্তব নয়। এই দৃষ্টিতে অস্ত্র সম্বরণ আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন প্রশংসনীয় সঠিক কাজ। পরিস্থিতিকে আরো সহজ করার পথ অবলম্বন দরকার। আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রশ্নে বিরোধীতা ও যথাযথ। বিষয়টি সাংবিধান সম্মত নয়। সাংবিধানিক বিধির আওতায়, স্থানীয় জেলা পরিষদের সংস্থান হয়েছে। নীতিগতভাবে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রতিও উভয় পক্ষ অঙ্গিকারাবদ্ধ। তবে এই ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় মাথাভারি আর অতিরিক্ত আর্থিক দায়সম্পন্ন। তদুপরি শান্তি স্থাপক ও নয়, এটাই প্রধান বিবেচ্য। স্থানীয় সরকার নয়, জেলা পরিষদ আইনে সামান্য সংশোধনীর ব্যবস্থা করে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সংস্থান করা হয়েছে। সাংবিধানিক আইন ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী নয়, জনসংহতি সমিতিকে এ ধারণা দান, সরকারেরই দায়িত্ব। অন্যান্য প্রশ্নেও নমনীয় ও কৌশলপুর্ণ অবস্থান নেওয়া আবশ্যক। তবু এ বলা যৌক্তিক যে, এখন পার্বত্য সংকট সমাধানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান রাজনৈতিক সংকট তার কঠিন অবয়বের ভিতর, অজান্তে অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে সরল সহজ সমাধানের দিকে এগিয়েছে এবং এগুবে। এ আশাবাদ পোষনযোগ্য। এটা কোন অতিশয়োক্তিও নয়। উপজাতীয় আন্দোলনের রক্তাক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ এখন আর অবশিষ্ট নেই। ওটা আগের সংবিধান অমান্যতার একগুয়েমী ও পরিহার করেছে। গণতন্ত্রকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করায় জনসংহতি সমিতিকে এখন আর মুখ্যতঃ গোয়ার সংগঠন ভাবার অবকাশ ও নেই। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপুর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌছাতে ও হানাহানির স্থায়ী অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে সমিতি স্বউদ্যোগে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এই সদিচ্ছাটি খোলাখুলি ঘোষণার মাধ্যমে নীতি হিসাবেও গৃহীত যথা ঃ

'(ক) এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়, তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীন জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ শান্তিপুর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য।'
(সূত্র ঃ জনসংহতি সমিতির জরুরী বিজ্ঞপ্তি নং ৩১-১০-৯১)

'(খ) (সমিতি) চায় সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতিদ্রুত গতিতে অবসান করে সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গনতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধনসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, সংহতি, সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস-প্রথা, প্রবাদ, ভাষা, ঐতিহ্য, ভূমির অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না। (সূত্র ঃ ঐ)

এই সর্বশেষ ঘোষিত নীতি ও অঙ্গিকার সুত্রে বিরোধের আকার আয়তন এখন সীমিত। এখন মাত্র বুঝার অভাবেই ব্যাপারটি জটিল। কার্যতঃ মীমাংসার পটভূমি রচিত হয়ে গেছে। এখন মীমাংসা না হওয়া বা তাতে সফল হতে না পারা হবে দুঃখজনক ব্যর্থতা। আপনা আপনি গড়ে ওঠা সাফল্যকে অগ্রগতি হিসেবে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে পরিপূর্ণ মীমাংসায় পরিণত করতে পারাকেই কৃতিত্ব জ্ঞান করা যাবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষে এখন পিছিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। সরকার পক্ষ অনুকূল অবস্থান অর্জন করেছেন। এই অবস্থানকে অগ্রগতির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ আছে।

বাংলাদেশের সংবিধান বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক। এর বিপরীতে জনসংহতি সমিতির মুল দাবি বিশুদ্ধ যুক্ত রাষ্ট্রীয়। এই সাংবিধানিক সংঘাত, সংশোধিত দাবীতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত নেই। এই দাবীতে এককেন্দ্রিকতার সাথে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নীতির সামঞ্জস্য বিধান চাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এক কেন্দ্রিকতা পরিহার নয়, এখন এই নীতি অবস্থান ঠিক রেখে, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন বিধিসম্মত কি না, তার পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার বিশ্লেষণ হতে পারে।
ব্যবস্থাটি সাংবিধানিক মূলনীতিকে ক্ষুণ্ন করে কিনা এ প্রশ্নটির উত্তর পেতে হবে। এই আইনগত প্রশ্নটির মীমাসার ক্ষেত্র রাজনৈতিক অঙ্গন নয়, বিশেষজ্ঞ আইনজ্ঞ সভা ও সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রশ্নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হবে ঃ সংশোধন সাপেক্ষ মূল এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাই আপাততঃ মান্য। এই পর্যায়ে বিকল্প হলো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ও জেলা পরিষদগুলোর গ্রহণযোগ্য রূপরেখা পুনরনির্ধারন করা, যাতে বিধি সম্মত ব্যবস্থা হিসাবে, তৎপ্রতি জাতি সম্মতি প্রদান করে। কিন্তু এর অর্থ কোনক্রমেই কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে পরিহার বা খর্ব করা নয়। সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রই সমুদয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয় শাসন ক্ষমতাই অঞ্চল বা অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য। ১২-৫-৯২ তারিখে প্রদত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাগড়াছড়ি ভাষণে সাংবিধানিক

মীমাংসার প্রস্তাব ছিলো। তারই অনুকরণে জনসংহতি সমিতি স্বীয় দাবীনামা সংশোধন ও অস্ত্র বিরতির ঘোষণা দেয়। সুতরাং ওটাকে সাংবিধানিক মীমাংসার পক্ষে পদক্ষেপ ভাবাই সঠিক। এ প্রশ্নে এ বলা ঠিক নয় যে আঞ্চলিক পরিষদের প্রয়োজন নেই। জনসংহতি সমিতির পক্ষে প্রদত্ত এর প্রত্যুত্তরটিও অন্ধ ধারণার অভিব্যক্তি, যাতে বলা হয়েছে ঃ তাতে তাদের দাবীটি পূরণ হয় না।

আরেক আশাব্যঞ্জক কথা হলো ঃ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই বিরোধীয় অঞ্চল নয়। জনসংহতি সমিতির দাবিকৃত আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের এখতিয়ার থেকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল মুক্ত। সমিতি স্বীয় দাবী নং ২ ৫/ক) ও ২(৫/খ) তে এর বর্ণনা প্রদান করেছে যথা ঃ

'দাবী নং ২ (৫/ক)

কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতুবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল, পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।'

'দাবী নং ২ (৫/খ)

'কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা।'

(সূত্র ঃ সংশোধিত দাবীনামা)

চুক্তিতে ও জেলা পরিষদ আইন ৬৪ তে এই বক্তব্য গৃহীত হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও স্থানীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের আয়তন হয় নিম্নরূপ, যথা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় অঞ্চল ঃ

১। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা +

২। বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এরাকা +

৩। রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা=আনুমানিক

১০.০০ বর্গমাইল

৪। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ঃ ক) রাষ্ট্রীয় বন	ঃ	৩১৬৬.০০ বর্গমাইল
খ) কর্ণফুলী হ্রদ (অধিগ্রহণ কৃত)	ঃ	২৫৬.০০ বর্গমাইল
গ) সংরক্ষিত বনাঞ্চল (ঐ)	ঃ	১২২০.৯৬ বর্গমাইল
মোট কেন্দ্রীয় অঞ্চল	ঃ	৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল
ঘ) স্থানীয় শাসিত অঞ্চল (গ্রামাঞ্চল)	ঃ	৪৪০.০৪ বর্গমাইল
সর্বমোট আয়তন	ঃ	৫০৯৩.০০ বর্গমাইল

হিসাবটিকে শুভঙ্করের ফাঁকি মনে হওয়া, এবং তাতে প্রতিকূল ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাও সম্ভব। কিন্তু এটি আসলে এই লেখকের স্বকপোল কল্পিত অপব্যাখ্যা নয়। অধিগ্রহণ বহির্ভূত অঞ্চলই সমিতির দাবীভুক্ত এলাকা হওয়ায়, বসতি সহ তার আয়তন মোট ৪৪০.০৪ বর্গমাইলই হয়। বাকি ৪৬৫২-৯৬ বর্গমাইল প্রকৃতই

কেন্দ্রীয় অঞ্চল। চট্টগ্রাম থেকে এতদাঞ্চলের পৃথক জেলা হিসাবে বিভক্ত হওয়ার পর সেই ১৮৬৫ সালের এক্ট নং-৭ ধারা নং ২ যথা ঃ কালকাতা গেলেট ১লা ফেব্রুয়ারী-১৮৭১ খ্রীঃ সমুদয় বন ও পাহাড়, কেন্দ্র শাসিত খাস অথবা সংরক্ষিত। কর্ণফুলী হ্রদভুক্ত এলাকাটিও ১৯৫৬ সালে অধিগ্রহণকৃত। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রয়োজনের সুনির্দিষ্ট কারণে কেন্দ্রীয় বন আইন, আবগারী আইন, মৎস্য আইন, ও শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন আইনে, বর্ণিত অঞ্চলগুলো স্থানীয় নয়, জাতীয় সম্পদ বা সম্পত্তি। এবং এ হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ নিয়ন্ত্রিত। এই কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রশ্নাতীত। এটা বিতর্কিত বিষয় নয়। তবে জেলা প্রশাসকেরা একাধারে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসক হওয়ার দ্বৈত ক্ষমতাবলে, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের আবাদযোগ্য অনেক এলাকাই, অস্থায়ী ভিত্তিতে বন্দোবস্তি প্রদান করেছেন। ওটা বসতিতে পরিণত হয়েছে, তবে আইনতঃ বন থেকে অবমুক্ত হয়নি। বাস্তবে এই সব আবাদী অঞ্চল অবমুক্ত ধরা যায়, যা মূল বসতি অঞ্চলের অংশ। এই যোগ বিয়োগের ভিত্তিতে অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক এলাকাই বসতি অঞ্চলে পড়ে। তাতে স্থানীয় শাসনাধীন এলাকার আয়তন নিম্নাকারে বৃদ্ধি পাবে যথা ঃ

ক) স্বীকৃত বসতি অঞ্চল ৪৪০.০৪ বর্গ মাইল
খ) অশ্রেণী ভুক্ত বনের বসতি অঞ্চল (৩১৬৬/২)=১৫৮৩.০০ বর্গমাইল সুতরাং স্থানীয় শাসনযোগ্য অঞ্চল সর্বমোট ২০২৩.০৪ বর্গমাইল মাত্র।

এই স্থানীয় আয়তন তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় এলাকার অংশের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে। এই আনুমানিক আয়তনের পরিমাণে প্রকৃত বসতির ভিত্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাও সম্ভব।
যেহেতু একটি বিব্রতকর রাজনৈতিক জটিলতার উভয় পাক্ষিক মীমাংসাই কাম্য, সেহেতু দাবীপূরণ ও ছাড় দানের পক্ষে উভয় পক্ষকে নমনীয় হতে হবে। মূল লক্ষ্য হবে ঃ জয়-পরাজয় নয়, শান্তি স্থাপন। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলাভুক্ত উপরোক্ত আয়তন বিশিষ্ট অঞ্চলই মাত্র, তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের বিষয় ভিত্তিক এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমুদয় ও সামগ্রিক পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিষদীয় এখতিয়ারে পড়ে না। আঞ্চলিক পরিষদের কোন স্থিতিভূমিও নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট নয়। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদ প্রশাসনিক ইউনিট হীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত। এ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বাধা হলো অনুচ্ছেদ নং ৫৯ যথা ঃ

'বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৫৯ (১)।
আইনানুযায়ী নির্ধারিত ব্যক্তিদের সনম্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'

বাঙালী বনাম অবাঙালী নিয়তি।

প্রকৃতি ও সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার প্রাচুর্য্যে বাস করে ও স্থানীয় অবাঙালীদের অভাবী অশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যহীন থাকা দুর্ভাগ্যজনক। অবশিষ্ট বাংলাদেশীদের পক্ষে, এখানে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো দুষ্পাপ্য আর ঈর্ষনীয়। এখানে কি কি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তা নয়, বরং কি কি দেয়া হয় না, তাই বিবেচ্য। তবু এখানে দুর্গম পাহাড়াভ্যন্তরে অভাবী, অশিক্ষিত, রোগ জ্বর-জ্বর, অপগন্ড লোকের সংখ্যা প্রচুর, যাদের দুরবস্থা দেখে করুণার উদ্রেক হয়। বনের শিকড় আর লতা পাতা না থাকলে, দুর্ভিক্ষ অনটনে, একেক সময়, এদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতো।

গভীর ও উঁচু পাহাড় বনের বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন, এখনো জুম চাষ। সেই প্রাচীনকালের মত, এখন আর জুমে, প্রচুর ফল ফসল ফলে না। বন বাদাড় কমে গেছে। পাতলা বনের পোড়া স্বল্প ছাই ও আবর্জনা, জমির উর্বরতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে পারে না। তাই জুমে ফল ফসলের উৎপাদন কম হয়। পেশাগত অনগ্রসরতা আর অলসতা ও দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ। যে অগাধ বনজ সম্পদ আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে পারতো, জুম চাষের স্বল্প লাভের বিনিময়ে তাই তারা হামেশা অবাধে ধ্বংস করছে। প্রকৃতিতে নিহিত জীবিকা নির্বাহের উপায় ও উপকরণ আর সহজলভ্য সুযোগ সমুহ, মাত্র ক্ষুৎপিপাসা নিবারণেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সঞ্চয় ও সম্পদ সৃষ্টির কাজে তা তারা নিয়োজিত করছে না। পেশা ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনে এখনো তারা সচেষ্ট নয়। ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা এখনো পিছিয়ে আছে। সঞ্চয় আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শূণ্য থেকে পুর্ণ হওয়ার বাস্তব জ্ঞান তাদের নেই। কঠোর শ্রমের লাগাতার অনুশীলন, সঞ্চয় আর মিতব্যয়িতা নয়, স্বল্প আর খন্ডকালিন শ্রম, এবং অযাচিতে তাৎক্ষণিক বড় অংকের লাভই তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য। এ কারণেই স্থানীয় পেশা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তারা অধিক হারে অনুপস্থিত। উন্নয়নমূলক বিশাল বিপুল কর্মকান্ডে তাদের ভূমিকা নগণ্য আর চাকুরীতে সীমাবদ্ধ। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিপুল অংকের উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যবহারিক অংশ তাদের ভাগে অতি সামান্যই জুটে। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, আর চরিত্রগত পশ্চাদমুখীতা, স্থানীয় অবাঙালীদের ভাগ্য পরিবর্তনের পক্ষে প্রধান বাধা। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্ম উন্নয়নের অভাবকে, অন্য কোন বিকল্পের দ্বারা পুরণ করাও সম্ভব নয়। তাদের ভাগ্যোন্নয়নে প্রকৃতি চতুর্দিক থেকে নিজ সম্পদ উজাড় করে দিলেও, এবং মাত্র একটি দা আর একটি কুড়ালের অবলম্বনে বনাঞ্চলের বিপুল গাছ, বাঁশ, লতা পাতা ইত্যাদি করায়ত্ত থাকলেও, এবং সরকারী দান অনুদান, ঋণ, আর কল্যাণ প্রচেষ্টায় প্রদত্ত বিপুল সুযোগ-সুবিধা, সহজপ্রাপ্য হলেও তা সুফল দানে ব্যর্থ হচ্ছে।

বস্তুত ঃ স্থানীয় সংখ্যালঘুদের ভাগ্য, তাদের অগণিত সীমাবদ্ধতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

গুণগত উৎকর্ষতা ছাড়া এই পশ্চাদপদতা কাটান সম্ভব নয়। পেশা ও লেখাপড়ায় দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে লাগাতার কঠিন পরিশ্রম ব্যবসা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া তাদের ভাগ্যোন্নয়নের বিকল্প কোন পথ নেই। এখানে সরকার বা অন্য কোন পক্ষ অন্তরায় নয়।
চারিত্রিক গুণ ও অর্জিত যোগ্যতা, মানুষকে সব রকমের প্রতিকূলতার মাঝেও প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে। আত্ম উন্নয়নের এটাই প্রধান পুঁজি। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের বন্যা প্রবাহিত হওয়া সত্বেও, তার আর্থিক সুফল লাভ থেকে উপজাতীয়রা অনেকাংশে বঞ্চিত। কারণ এটা দানযোগ্য নয়, অর্জনযোগ্য বিষয়।

লেখাপড়া ও চাকুরীতে বেশ অগ্রসর হলেও বিভিন্নমুখী পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এই অবাঙালীরা সঙ্কুচিত। সরকারিভাবে তাদের অনেককে, পেশাদারী কাজের প্রশিক্ষণ, ঋণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। তবু ছোটখাটো পেশায় স্বউদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিতে হয়, নিজস্ব বিনিয়োগও লাগে। এভাবে অর্জিত দক্ষতা আর রোজগারকে সংগঠিত আর বহুমুখী করাই ভাগ্যোন্নয়নের উপায়। ভাগ্যোন্নয়নের এই ধারাগুলোর অনুশীলনে স্থানীয় অবাঙালীরা উদাসীন।
এই অঞ্চল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কাঠ, বাঁশ, লতা-পাতা ইত্যাদি হলো বিভিন্ন শিল্পপণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল। বর্ণীত বনজ সম্পদ ভিত্তিক বিভিন্ন পেশা ও কুটির শিল্প, রোজি রোজগারের বহুমুখী উপায় হওয়ার যোগ্য। কিন্তু স্থানীয় অবাঙালীরা তার স্থুল ব্যবহারেই অভ্যস্ত। দা, কুড়ালে কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া কিছুই তাদের জানা নেই। অথচ সারা বাংলাদেশ জুড়ে এরই বিভিন্নমুখী ব্যবহারের সাথে জড়িত বহু লক্ষ শিল্পী কারিগর আর নির্মাণ কর্মী মোটা অংকের রোজি রোজগারে জীবিকা নির্বাহ করছে।

এতদাঞ্চলের নদী-নালা আর কর্ণফুলী হ্রদ, সমৃদ্ধ মৎস্য ভান্ডার। এগুলো নৌপথ হিসেবে ও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে মৎস্য ধরা ও নৌ-পরিবহন, রোজি রোজগারের অন্যতম উপায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্থানীয় অবাঙালিরা অনুৎসাহী। বহিরাগত বাঙালী মৎস্যজীবীরা মাছধরা ও তা বাজারজাত করার কাজে প্রায় একচেটিয়া ভাবে নিয়োজিত। নৌকা, সাম্পান ও লঞ্চে যাত্রী ও মাল পরিবহন একটি সমৃদ্ধ পেশা হলেও তৎপতি ও অবাঙালীরা অনাগ্রহী। মাঝি মাল্লা, মিস্ত্রি, খালাসী, সারেং সুকানী ইত্যাদি জাতের লোকও তাদের মাঝে বিরল। এক্ষেত্রটিও বাঙালীদের প্রায় একচেটিয়া দখলাধীন। এ দুটি ক্ষেত্রে তাদের স্থলে হাজার হাজার বাঙালীর কর্মসংস্থান এতদাঞ্চলেই বিদ্যমান।

স্থানীয় বাজার-হাট, শহর-বন্দরগুলো পণ্য খরিদ বিক্রির সমৃদ্ধ ঘাটি। তাতে বনজ, কৃষি ও শিল্পপণ্য ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামালের খরিদ বিক্রি একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এই বিপনী কেন্দ্রগুলোতে বসার জায়গার সুযোগ লাভে, স্থানীয় অবাঙালীদের অগ্রাধিকার আছে। ঋন গ্রহণ ও স্বউদ্যোগে কিছু পুঁজির

যোগাড় করাও তাদের অনেকের পক্ষে অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ তারা প্রাপ্ত দোকান ভিটা লাইসেন্স পারমিট ও সরঞ্জামাদি কিছু নগদ প্রাপ্তির বিনিময়ে বাঙালীদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়ের অভাবে দোকানে বা ব্যবসাস্থলে বসে, ধীরে ধীরে খরিদ বিক্রি করা, তাদের ধাতস্ত নয়। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকেও তারা নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে।

সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয় বহুল নির্মাণ উদ্যোগগুলোতে, সাধারণ শ্রমিক থেকে, দক্ষ প্রকৌশলী পর্যন্ত বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় অবাঙালীরা সে জনশক্তি যোগাতে অক্ষম। কোন নির্মাণ কাজেই শ্রমজীবী ও প্রকৌশলী হিসেবে তাদের পাওয়া যায় না। ফলে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, আরাকশি, ইটের কারিগর, মাটিয়াল, প্রকৌশলী ইত্যাদি নির্মাণ কর্মী ও শ্রমিক মাত্রই বাঙালী না হলেও তাতে অবাঙ্গালীদের সংখ্যা নগণ্য।

প্রাপ্ত জায়গা জমিগুলোতে কোন মতে কিছু ফল ফসল উৎপাদন ও খাওয়া পরা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অতিরিক্ত শ্রম দিতে তারা অনভ্যস্ত। বছরের মাস তিনেক পরিশ্রম, উৎপাদন, ও তৎপর বাকি প্রায় নয় মাস অলস ভোগে কাটিয়ে দেয়াই হলো জুমিয়া জীবনের চিরাচরির অভ্যাস। এটাই তাদেরকে গরীব ও শ্রম বিমুখ করে রেখেছে।

পেশাতেও তারা বিস্তর বাছবিচার করে। কৃষি, চাকুরী ও বনজ দ্রব্য আহরণ, এই তিন পেশাতেই তাদের রোজি রোজগার গন্ডিভূত। রাজা উজির না হলেও তারা মুচি, মেথর, জেলে, মাঝি, কুলি, মজুর, কুমার, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি ইতর পেশাজীবী হতে নারাজ। অথচ তাদের চোখের সামনেই একজন বাঙালী সামান্য কুলি থেকে অধ্যবসায়, সঞ্চয় ও পেশাগত সততার গুণে, ধনাঢ্য সওদাগরে পরিণত হচ্ছে। একজন নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী হচ্ছে শিল্পপতি, আর ভবঘুরে চালচুলাহীন ব্যক্তি সমাজ পতির মর্যাদায় উন্নীত হচ্ছে। বাঙালীদের উক্ত ভাগ্যোন্নয়ন অলৌকিক ঘটনা নয়। তারা কারো কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিয়ে ভাগ্যবান ও নয়।
বস্তুতঃ স্থানীয় মঙ্গোলীয় সমাজের চাহিদার ক্ষেত্রে এমন অনেক শূণ্যতা বিদ্যমান, যা তাদের কারো দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। ঐ চাহিদার শূণ্যতাকে অনুসরণ করেই বাঙালীরা এখানে উপস্থিত এবং খোদ অবাঙালীদের সহযোগিতায়ই বাঞ্ছিত শূণ্য স্থান পুরণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এভাবে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, বিপনন ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় সমাসীন। বাঙালীদের বর্তমান অগ্রণী ভূমিকা ও সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের শক্তি বৃদ্ধির সহযোগী উপসর্গ মাত্র, প্রধান অবলম্বন নয়।
যতই উচ্চবাচ্য করা হোক না কেন, এতদাঞ্চলে বাঙালী উপস্থিতি শূণ্যতা পূরনের প্রয়োজনে অবাঙালীদের দ্বারাই রচিত। অতীতের কিছু হিন্দু কুসিদজীবীর শোষণ ও অত্যাচার বাদে, চিরকাল অধিকাংশ বাঙালী স্থানীয় অবাঙালীদের সুহৃদই ছিলো এবং এখনো তারা তাই আছে।

উপজাতীয় দাবী দাওয়া ও স্বাতন্ত্র্যের রহস্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরকারী উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ণয় অত্যাবশ্যক। সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে, অতীতে তারা অবহেলিত ছিলো। কিন্তু আজকাল তারা আর নগণ্য করুণার পাত্র নয়। নিজেদের শক্তিমত্তাই তাদেরকে গুরুত্ব দান করেছে। তাদের দাবী হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের নিজস্ব অঞ্চল। এখানে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সংখ্যা প্রাধান্য আছে, তাই তারা ন্যায়তঃ স্বশাসন বা সায়ত্তসামন ক্ষমতা লাভের অধিকারী। এই অঞ্চলে অস্বাভাবিক ভাবে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ ঘটেছে ও ঘটছে যদ্বারা উপজাতীয়দের অস্তিত্ব আর অধিকার বিপন্ন। এরই রক্ষাকবচ আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এটাই উপজাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের মূল কথা।
এই আন্দোলনটির মূল প্রবক্তা বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এটাকে বিজয়ী চরিত্র দানের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ আমলের শুরুতে ১৯৭২ খ্রীঃ সালে, তৎকর্তৃক জন সংহতি সমিতি ও তার অঙ্গসংগঠন সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে উপজাতীয় বিদ্রোহী চরিত্র পুর্বাপর সম্পর্কহীন বা আকস্মিত কিছু নয়। এই বিদ্রোহ প্রবণতা, অন্যতম স্থানীয় ঐতিহ্য। এই বক্তব্যটি বুঝার পক্ষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইতিহাস উপস্থাপন দরকার। নয়তো এটা সস্তা বুলি মনে হবে। বাস্তব ভিত্তিক একটি মীমাংসা নিরূপণে এবং সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য লাভের প্রয়োজনেও বটে, বিষয়টির পর্যালোচনা আবশ্যক। খন্ডিত আর পক্ষপাতপুর্ণ চিত্র ইতিমধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে রেখেছে, যা খন্ডন করা জরুরী। সুতরাং এখানে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও পরিপুর্ণ ইতিহাস উপস্থাপন অপরিহার্য্য। এখানে সংখ্যাগত প্রাধান্য ও ক্ষমতার প্রভাব গুণে, চাকমা ও মার্মারাই সর্বাধিক রাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী। শান্তি আর অশান্তির পরিবেশটিও তাদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই আলোচনায় চাকমা ও মার্মারাই মুখ্য।

উপজাতীয় পন্ডিতদের দ্বারা লিখিত নিজেদের ইতিহাস, ভুল তথ্য আর অতিরঞ্জন মন্ডিত। হাল আমলে উদঘাটিত দলিল প্রমাণগুলো, নির্ভরযোগ্য ভিন্ন তথ্যই প্রদান করে। এখানে তাই প্রামাণ্য আঞ্চলিক ও উপজাতীয় ইতিহাস আলোচিত হলো।

অতীতে কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের কোন স্বতন্ত্র অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিলো না। ১৮৬০ খ্রীঃ সালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে, চট্টগ্রামকে সমতলে ও পাহাড়ে বিভক্ত করে, সীমান্তবর্তী পূর্বাঞ্চলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাম দেয়া হয়। তখন এতদাঞ্চলের পরিচয় জ্ঞাপক কোন পৃথক নাম না থাকায়, চট্টগ্রাম নামকেই পর্বতের দ্বারা বিশেষিত করে, এতদাঞ্চলের পৃথক পরিচয় চিহ্নিত হয়। অঞ্চলটি দুর্গম পর্বত সংকুল। এটা এ কারণে সীমান্তবর্তী অধিক দুর্গমও পর্বত সংকুল ত্রিপুরা লুসাই ও

আরাকান থেকে ও বিচ্ছিন্ন। এর অধিবাসীরা পর্বত ঢালে অবস্থিত সুগম নিম্নাঞ্চলের বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয়ভাবে এতদাঞ্চলের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রি ও রপ্তানী এবং প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানীর মাধ্যম হলো সংলগ্ন নিম্নাঞ্চল ভূক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল ও তথাকার অধিবাসী জনগোষ্ঠী। এ চাহিদা পূরণের আর কোন সহজ বিকল্প নেই। সুতরাং এ পর্বতবাসীদের ভাগ্য প্রকৃতিগতভাবেই বাংলাদেশও বাঙ্গালীদের সাথে গ্রথিত। ইচ্ছা অনিচ্ছা এখানে পরাভূত। যেহেতু নিম্নাঞ্চলের প্রধান অধিবাসী বাঙ্গালী আর এই অঞ্চলের লোক স্থানীয় ভাবে অভিবাসী এবং এতদাঞ্চল সেই চট্টগ্রামেরই বিছিন্ন অংশ, সেহেতু এটা মূলত বাঙ্গালীরই স্বাদেশ ভূমি। আগেকার জন-বিরলতা, শুধু বাঙ্গালীর ক্ষেত্রেই নয়, উপজাতীয়দের বেলায়ও প্রযোজ্য ছিলো। বৃটিশ আমলের প্রথম অর্ধেককাল পর্যন্ত, এতদাঞ্চলের প্রধান ও প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিলো কুকি জনগোষ্ঠী, যারা এখনো সর্বাধিক ক্ষুদ্র স্থানীয় সম্প্রদায় হয়ে টিকে আছে। বৃটিশ শক্তির দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বহিরাগত উপজাতীয়দের বিপুল সংখ্যায় অভিবাসন দান, এতদাঞ্চলে উপজাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক দুর্গমতা, আইনী বাধা বিপত্তি, জন্তু আনোয়ারের ভয়, সংক্রামক রোগ, সমাজহীনতা, আর সমতলে জমি-জমার সহজ প্রাপ্যতাকেই, অতীতে এতদাঞ্চলের বাঙ্গালী বিরল অনাবাদী থাকার কারণ বলে ভাবা যায়। তাদের বিপরীতে উপজাতীয় জনসংখ্যা ও যথেস্ট ছিলো না। এখানে উপজাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির আকস্মিক প্রধান কারণ হলো ঃ ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ সালে অনুষ্ঠিত বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান দখল ও তথাকার উদ্বাস্তুদের নিয়ে বার্মা ব্রিটিশে পারস্পরিক যুদ্ধ, এবং বৃটিশদের ধর্মীয় ঔপনিবেশিক স্বার্থ, যদ্দরুণ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আরাকানী বাস্তুত্যাগ করে সীমান্তবর্তী এই বাংলাদেশ অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাদের অধিকাংশ কখনো স্বদেশে ফিরৎ যায়নি। উপনিবেশবাদী এদেশীয় ইংরেজ শাসকদের উৎসাহে, ঐ শরণার্থীদের অধিকাংশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী অঞ্চলে, পুনর্বাসিত হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী কুকি ও বাঙ্গালীরা অকস্মাৎ কৃত্রিমভাবে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যায়। এটাই এতদাঞ্চলের উপজাতীয়দের সংখ্যা প্রাধান্যের রহস্য।

বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চলে বেআইনী বহিরাগত বা অনুপ্রবেশকারী, উপজাতীয়দের এ দাবীর বিপরীতে ইতিহাসই সাক্ষী যে, তারা নিজেরাই বহিরাগত। উপজাতিদের বিতর্কিত নাগরিকত্ব, সরকারি আনুকূল্যে এখানে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। বাঙ্গালী অধিকার ও আবাসনের প্রতি তাদের আপত্তি হলো অনধিকার চর্চা। অধিকন্তু তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি তারা অসহিষ্ণু এবং বাঙ্গালীরা তাদের হাতে নৃশংসভাবে নিগৃহীত।

বগিরাগত উপজাতীয় জনস্রোত কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে গ্রাস করেছে তার প্রামাণ্য নিরপেক্ষ বিরবণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

'অনুমান করা হয়, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, বর্মী আক্রমণের ফলে,

আরাকানের দুই তৃতীয়াংশ লোক, পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে।..... চামকারা ঐ আরাকানী উদ্বাস্তুদের একটি অংশ.....।'
(সূত্র ঃ ট্রাইবস্‌ম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস; প্রঃ পিয়ের বেসানেত, পৃঃ/৯
(অনুবাদঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি)

যেহেতু উপজাতীয় জনগণের অধিকাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত, তাদের এদেশীয় নাগরিকত্ব মৌলিক নয়, তাই অতীতে তাদেরকে বসবাস করতে দেয়া হলেও, তারা ছিলো ভূমিস্বত্বহীন জুমিয়া। তখন অনাবাদী পাহাড়াঞ্চল আবাদের প্রয়োজন ছিলো। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের দীর্ঘকাল খয়রাতী সাহায্যে লালন-পালন করাও সহজ ছিলো না। তাই তাদের স্বেচ্ছাকৃত জুম চাষে, নীরব অনুমোদন ছিলো। তবে জুম চাষ ও জুম ভূমির স্বত্ব অনুমোদিত হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে, জন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হওয়ায়, স্বঘোষিত বা ঐতিহ্যানুগভাবে নিযুক্ত উপজাতীয় সর্দারদের প্রবর্তিত প্রতিটি জুমিয়া পরিবার থেকে আদায়কৃত নির্দিষ্ট পরিমান কর ও তার একটি অংশ আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে সরকারকে প্রদানের ধারা প্রচলিত হয়। প্রথমে এই আর্থিক লেনদেন অনানুষ্ঠানিক উপঢৌকন ছিলো। পরে তা জুমকর নামে নিয়মিত সরকারী প্রাপ্যে পরিণত এবং সর্দারদের মর্যাদা ও নিয়মিত হয়। এই বাৎসরিক পারিবারিক জুম করে সরকারের অংশ নগণ্য ষষ্ঠাংশ মাত্র। এর পাঁচগুন ভোগ করে সর্দার ও হেড ম্যানেরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেতৃস্থানীয় সর্দারেরা সমভূমির লোকদের সাথে, পাহাড়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা লাভের জন্য, চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্মকর্তাকে, কিছু কিছু বার্ষিক উপঢৌকন দিতেন। পরে সেটা রাজস্বে পরিণত হয়' (সুত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডোয়েলার্স দেয়ার ইন, টি এইচ লুইন, পৃঃ ২২)

'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা নিয়মিতভাবে দেশের সার্বভৌম কোন রাজশক্তির দ্বারা নয়, স্থানীয় সাধারণ জুমিয়া, কুকি ও অন্যান্য বাসিন্দাদের দ্বারাই রাজা নিযুক্ত। তারা মোগল সরকারকে ১০৭৭ মঘী বা ১৭১৫ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত, কোন কর বা খাজনাই দিতেন না। স্রু (সূত্র ঃ রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ খ্রীঃ)। এর অর্থ তারা স্থানীয় নাগরিক ছিল না।
উপজাতীয় রাজা প্রজাদের মর্যাদা ও জুম রাজস্ব নিজস্ব ব্যবস্থা, সরকার প্রবর্তিত কিছু নয়। অভিবাসন লাভের পরে স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্দারী ও জুমকর ব্যবস্থা, প্রশাসন ও রাজস্বের পক্ষে সহায়ক বলে, সরকার তা অনুমোদন করে নেন। সরকার ও উপজাতীয়দের মধ্যকার এই অনিয়মিত ব্যবস্থাকে, ১৯০০ খ্রীঃ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় শাসন বিধি রেগুলেশন নং ১ এর আওতায় বিধিবদ্ধ করা হয়। এই নতুন আইনেও উপজাতীয়দের অবাধ ভূমিস্বত্ব স্বীকৃত হয়নি। গোটা জেলাকে রাখা হয় শাসন বর্হিভূত ও স্থানীয় জেলা প্রশাসকের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন। ভূমি খরিদ বিক্রি ভোগ ও হস্তান্তর রাখা হয় অনুমতি সাপেক্ষ। এটা উপজাতিদের বাধ্য অনুগত

আমলা শাসিত অস্থায়ী প্রজা হওয়ার দলিল। নাগরিক অধিকার সম্পন্ন স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার মর্যাদা এতে স্বীকৃতি নয়।

নতুন প্রজন্মের উপজাতীয়রা, অতীত ইতিহাস না জানায় ও জন্মগতভাবে এদেশে বর্ধিত হওয়ায়, এবং এখানকার প্রশাসনিক ও জনসংখ্যাগত পরিবেশ তাদের অনুকূলে থাকায়, স্বাভাকিকভাবে এ ধারণার অধিকারী হয়েছে যে, এটা উপজাতীয়দের নিজস্ব অঞ্চল। এখানে তাদের উন্নতি আর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা এবং সংখ্যা প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা হলো ন্যায্য। এতদ্বাঞ্চলে বাঙ্গালীদের অবাধ অনুপ্রবেশ তাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। এর বিপরীতে এই অঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস প্রচারিত হলে, তা হিংসা আর উগ্রতা পরিহারে সহায়ক হতো। তারা ভাববার সুযোগ পেতো যে, এদেশ ও তার অধিবাসীদের আস্থা অর্জনের মাঝেই, তাদের ভাগ্যের নিরাপত্তা নিহিত। বিদ্রোহ সঠিক পথ নয়।

এই পর্বতাঞ্চলে উপজাতীয়দের দ্বারা এ যাবৎ মোট চারবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। ১৭২৪ খ্রীঃ সালে মাতামুহুরী সীমান্তে সর্ব প্রথম জালাল খাঁ নামীয় জনৈক উপজাতীয় প্রধান, মোগলদের অবাধ্য হোন। ফলে তিনি সদলবলে আক্রান্ত ও আরাকানে বিতাড়িত হোন। দ্বিতীয় বার ১৭৭৬ খ্রীঃ সালে কথিত চাকমা রাজা শের দৌলৎ খাঁ, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটান। আক্রমন ও অবরোধে বাধ্য হয়ে, ১৭৮৭ সালে তাঁর ছেলে রাজা জান বখশ খাঁর আত্মসর্পনের মাধ্যমে সে বিদ্রোহের অবসান হয়। তৃতীয় ঘটনা ১৯৪৭ খ্রীঃ সালের দেশ বিভাগকালে অনুষ্ঠিত। উত্তরাঞ্চলীয় কতিপয় চাকমা, নেতা ভারতে যোগদানের পক্ষে, এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় কিছু মগনেতা, সে অঞ্চলের বার্মার সাথে সংযুক্তি কামনায়, পাকিস্তান ভুক্তির বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করেন। আবার সামরিক শক্তি বলে সে বিদ্রোহ দমান হয়। শেষ ঘটনার শুরু ১৯৭২ খ্রীঃ সালে, যা ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত এক চুক্তির ফলে প্রায় দমিত হয়েছে, তবে কিছু বিশৃঙ্খলা অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। এই চতুর্থ বিদ্রোহটি দীর্ঘস্থায়ী, সর্বাধিক জটিল ও অধিক রক্তক্ষয়ী। পূর্বের তিনটি বিদ্রোহে সামরিক হস্তক্ষেপই ছিলো মুখ্য দমননীতি। এই চতুর্থটির বেলায় সামরিক হস্তক্ষেপের পাশাপাশি সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও আরোপিত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ সফল নয়। শান্তি স্থাপনের পক্ষে সামরিক বা রাজনৈতিক যে কোন কার্যক্রম গ্রহণের আগে ভেবে দেখা দরকার ঃ স্থানীয় উপজাতিরা দীর্ঘ অতীতকাল থেকেই বিদ্রোহ প্রবণ। এটি তাদের আদি স্বদেশ ভূমিও নয়। এই বিদ্রোহ প্রবণতা আকস্মিক বা সাময়িক নয়। এর লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসন ক্ষমতা লাভের চেয়ে বেশী কিছু।

সীমান্ত পারের বহিরাঞ্চলসহ এতদাঞ্চল দুর্গম ও উপজাতি অধ্যুষিত। পরিবেশগতভাবে এর অবস্থান উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল। উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্য, প্রান্তিক অবস্থান, আর বিদেশী সংযোগ, তাদের অধিকার

আন্দোলনের শক্তির ভিত্তি। এর বিপরীতে শুধু সময়ক্ষেপন আর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সমাধানের উপায় নয়। সীমান্তকে বহির যোগাযোগ থেকে মুক্ত এবং জনসংখ্যাকে বাঙ্গালী ও পাহাড়ীতে ভারসাম্যময় অথবা উপজাতিদের সংখ্যা লঘু করার মাঝেই শান্তি নিহিত বলে মনে করা যায়।

উপজাতিরা আদতে বহিরাগত জনগোষ্ঠী। এ দেশে তাদের আগমন ও বসবাস ক্রমান্বয়ে ঘটেছে। চাকমাদের ভাষা এক ধরনের আঞ্চলিক বাংলা, যার মাঝে ভাওয়াইয়া, উর্দু, হিন্দি, আরবী, ফারসী ও স্থানীয় চট্টগ্রামী শব্দ ও কথ্যরীতি বিপুলভাবে মিশ্রিত। চাকমা কিংবদন্তিকে ইতিহাস বলে দাবী করা হলেও, দলিল প্রমাণের দ্বারা ভিন্ন আরেক ইতিহাস উদঘাটিত হয়। নতুন উদঘাটিত প্রামাণ্য তথ্যাদির মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, এদেশে চাকমা ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৭৩৭ খ্রীঃ সাল। আরাকানের রোসাং থেকে আগত চাকমা সর্দার শের মস্ত খান, ঐ সালে চট্টগ্রামের মোগল নায়েব জুল কদর খান কর্তৃক এতদাঞ্চলীয় জুম বঙ্গের জুমিয়াদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের তহসিলদারী এবং কোদালা উপত্যকায় কিছু অনাবাদী খাস পাহাড়ী জমির বন্দোবস্তি লাভ করেন। ঐ বন্দোবস্তি ও তহসিলদারীকে অবলম্বন করে, সে সময় আগত প্রথম একদল চাকমা প্রজা শের মস্ত খাঁর জমি আবাদে নিযুক্তহয়। ডঃ এ এম সিরাজুদ্দিন স্বীয় ঐতিহাসিক গবেষণায় এর বিশদ বর্ণনা দান করায়, এবং চাকমা রাণী কালিন্দি, রাজানগরের বুদ্ধ মন্দিরের গায় লিখিত লিপিতে শের মস্ত খাঁকে আদি চাকমা রাজা বলে বর্ণনা দেয়ায় এবং সর্বোপরি একটি প্রাচীন চাকমা গানে আদি রাজা শের মস্ত খাঁকে রোসাং থেকে আগত বলে স্বীকার করায়, এটা সন্দেহাতীত যে, ১৭৩৭ খ্রীঃ সালই এতদাঞ্চলে চাকমাদের প্রথম ও আংশিক প্রতিষ্ঠাকাল। পরে বৃটিশ আমলে তাদের সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

ডঃ এ এম সিরাজুদ্দিনের ঐতিহাসিক গবেষণায় উদঘাটিত হয়েছে যে, চন্দন খাঁ ও তাঁর বংশধরেরা ১৭১১ থেকে ১৭২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রামের সীমান্তে, উপজাতীয় রাজা ছিলেন। ঐ বংশের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ অবাধ্য হওয়ায়, মোগল ফৌজদার কর্তৃক ১৭২৪ খ্রীঃ সালে আক্রান্ত ও আরাকানে বিতাড়িত হোন। ঐ ঘটনার ১৩ বছর পর শেষ মস্ত খাঁ আরাকান থেকে এসে এতদাঞ্চলে আবির্ভূত হোন, এবং ঐ সুত্রেই কিছু চাকমার আগমন ঘটে। চন্দন খাঁ বংশের সাথে চাকমাদের সম্পর্ক থাকা প্রমাণিত নয়। যদিও চাকমা কিংবদন্তিতে চানান খাঁ নামের উল্লেখ আছে, চন্দন খাঁ নয়। যা বিভ্রান্তিকর। তবে এটা নিশ্চিত যে, ঐ প্রাথমিক অভিবাসনকালে চাকমাদের জনসংখ্যা অতি নগণ্যই ছিল। তখনো তারা আনুষ্ঠানিক সর্দারের অধীন জাতিগতভাবে আরাকানের বাসিন্দা। (সূত্র ঃ শের জব্বার খাঁর সীলমোহর)।

ডঃ আঃ করিম সাহেবের ঐতিহাসিক উদঘাটন, পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও ডে বারোজের অংকিত বাংলার প্রাচীন মানচিত্রের মাধ্যমে, আরো সঠিক ঐতিহাসিক

চিত্র উদঘাটিত হয় । তাতে বলা যায়, গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অধিকৃত দক্ষিণ চট্টগ্রামের স্থানীয় শাসক খোদা বখশ খানের নিয়ন্ত্রিত, আলীকদমের সীমান্তে, একটি চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল ছিলো, যা চাকমাদের বহুল কথিত উত্তর আরাকনবর্তী মইসা গিরি অঞ্চল হওয়া সম্ভব। এও সম্ভব যে, পরে তারা ঐ খোদা বখশ খাঁর বংশধরদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রজায় পরিনত হয়। যারা তাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। এই সুত্রে হয়তো আলীকদম তাদের প্রিয় রাজ্য ও রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছে। চাকমা কিংবদন্তিতে, খোদা বখশ খান তাদের রাজা না হলেও, আলীকদম তৈন ছড়ি অন্যতম চাকমা রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত। তাই এটা ভাবা সঙ্গত যে, উত্তর আরাকানবাসী চাকমারা স্থানান্তর ও আনুগত্য বদলের মা্ধ্যমে মুসলিম সামন্তদের প্রভাবাধীন প্রজা ও মিত্র ছিলো। সে সুত্রেও সম্ভব, উত্তরাধিকার ও বংশানুক্রমিক ধারায় চাকমা রাজারা নাম খেতাব আচার অনুষ্ঠান ও দরবারী সাজ পোষাকে, মুসলিম ঐতিহ্যের অনুসারী।

একদা মইসা গিরি অঞ্চলে মগ উৎপীড়ন তীব্র হয়ে দেখা দিলে এবং নিজেদের সামন্ত প্রধানেরা দুর্বল হয়ে উঠার কারণে, চাকমাদের বাংলাদেশে দেশান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সম্ভবতঃ মুসলিম সাহায্য আর সদ্ভাবের আকর্ষণে, তারা মাতামুহুরী উপত্যকা হয়ে বাংলাদেশের দিকে নেমে আসে। সেই দলেরই অন্যতম অগ্রপুরুষ হলেন রাজা শের মস্ত খাঁ ও তার নেতৃত্বাধীন লোকজন। এই বর্ণনার সমর্থনে শক্তিশালী প্রমাণ হলোঃ রাজা শের জব্বার খানের সীল মোহরটি, যা আরবী বর্ণে উৎকীর্ণ এবং যার ভাষ্য হলো 'রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, ১১১১ শের জব্বার খান' সুতরাং মঘী সন হিসাবে এটা নিশ্চিত যে ১৭৪৯ খ্রীঃ সালেও জাতিগতভাবে চাকমাদের আরাকান ত্যাগ অসমাপ্ত ছিলো এবং তাদের রাজারা ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ সালে বার্মা রাজার লিখিত চিঠির মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়, চাকমা নামীয় লোকেরা তখনো ছিলো সে দেশের প্রজা। ১৮১৮ খ্রীঃ সালে দলপতি জনৈক ফাপ্রুর অধীনে চার হাজার সংখ্যক টুংটুঙ্গ্যা চাকমা, আরাকান ত্যাগ করে এ দেশে আসে। চাক, থেক, দৈংনাক নামীয় কিছু চাকমাও এককালে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে বৃটিশ আমলে আরাকানবাসী চাকমাদের অব্যাহত আগমন ও নির্গমন প্রমাণ করে, আরাকানী চাকমা মগ ও অন্যান্য উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের দ্বারাই ধীরে ধীরে এদেশে উপজাতীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। এই সুত্রে জনপ্রিয় ঐ চাকমা গানটিও বিবেচ্য, যাতে তাদের রাজবংশীয় আদি কৌলিন্য আর আরাকানের রোসাংবাস স্বীকৃত, যথা ঃ

'আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিলো বাড়ি,
তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।'

অভাব দুর্ভিক্ষ আর অর্থনৈতিক দূরবস্থা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনই এখানকার লোকের অভাব ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। এটা কর্মসংস্থান, রুজি-রোজগার, খাদ্য ও বাসস্থান যোগাড়ের অবলম্বন তো বটেই, সম্পদ সৃষ্টিরও সহায়ক। একজন অভাবগ্রস্ত লোক মাত্র একটি দা ও কুড়াল অবলম্বন করে বিনা বাঁধায় নিকটবর্তী খাস বন ও পাহাড় থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময়ের ভিতর বাঁশ গাছ, বেত, লতা-পাতা, লাকড়ি, ঝাড়ু ফুল, বন্য তরিতরকারী ও শাকসবজি অনায়াসে সংগ্রহ করে এনে নিকটবর্তী বাজারে বা পাড়ায় বিক্রি করে, তার প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে দিনে দিনেই ঘরে ফিরতে পারে। এক প্রকার বন্য আলুতেও সাময়িক ক্ষুধা নিবারণের সুযোগ আছে। জীবিকা নির্বাহের এই প্রাকৃতিক সুযোগের সাথে কর্ণফুলী হ্রদ ও তার বিপুল পরিমান মৎস্য সম্পদ আর সহজ নৌ-যোগাযোগের সুবিধাগুলো সংযোজিত হয়েছে। তাই একমাত্র অনড় অলস ছাড়া কারো পক্ষে এতদাঞ্চলে ভুখা নাঙ্গা থাকা প্রায় অসম্ভব। তবু এতদাঞ্চলে স্বচ্ছল লোকের সংখ্যা নগণ্য, এবং সম্পদশালী লোক অত্যন্ত বিরল। সম্পদ গড়ার শিল্প বাণিজ্যে স্থানীয় লোকেরা তৎপর নয়, এটাই তাদের হীনতা ও দীনতার কারণ। এ সত্যটি পাহাড়ীদের বেলায় অধিক প্রযোজ্য।

সংরক্ষিত বন আর অশ্রেণীভুক্ত বনের সম্পদ পরিমানে বিপুল। বৈধ অবৈধ উপায়ে এই সম্পদ আহরণ চালান দেয়া ও খরিদ বিক্রি টাকা কমানোর এক বিরাট মাধ্যম। এই সম্পদ লোকালয় পার্শবর্তী হওয়ায় এবং হ্রদ ও নদী পথে যুক্ত থাকায় স্থানীয় কাঠুরেদের ও বেপারী মহলের নাগালাধীন। টাকা কমানোর এটাও সহজ ও পর্যাপ্ত সুযোগ। এই সুযোগকে স্থানীয় কাঠুরেদের মাধ্যমে কাজে লাগাচ্ছে প্রধানতঃ ব্যবসায়ী, ব্যাপারিপাচারকারী ও অর্থলোভী বন কর্মকর্তা ও কর্মচারী মহল। তাতে কাঠুরেদের কামাই রোজগার নগণ্য। তবে সম্পদশালী হচ্ছে বেপারী ব্যবসায়ী বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সম্পদ বন লুট হয়ে যাচ্ছে। নিস্ব হচ্ছে বন। সাধারণের এই কামাই রোজগারের সুত্র নিঃশেষ হয়ে পড়ছে।

১৭৬৯-৭০ সালের দেশজোড়া দুর্ভিক্ষে এক-তৃতীয়াংশ বাঙ্গালীর জীবনহানি, ১৮৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে অগণিত লোকের জীবননাশ এবং ১৯৪৩ সালের খাদ্যাভাবে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙ্গালীর অপমৃত্যু হলেও, পার্বত্য, চট্টগ্রাম তা থেকে মুক্ত ছিলো। তবু এখানেও মাঝে মধ্যে অভাব অসুবিধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ১৮৯১ সালে চেঙ্গী উপত্যকায় জুম কৃষি আশানুরূপ হয়নি। ফলে সর্বত্র খাদ্যশস্যের হাহাকার দেখা দেয়। তার মোকাবেলায় রেঙ্গুনী চাল খরিদ করে, সরকার তা ঋণ হিসাবে বিতরণের জন্য বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। পুনরায় ১৯০৫ সালে অসময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে, জুম পোড়ানো ও বীজ বুনা সম্ভব না হওয়ায়, খাদ্য শস্যের অভাব দেখা দেয়। এর প্রতিকারে জনগণের খাদ্যের সংস্থান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বনজ পণ্য সংগ্রহ ও বিক্রি, এবং কৃষি কাজের জন্য মাইনীর সংরক্ষিত বনের একাংশ মুক্ত করে দেয়া হয়। সমগ্র অঞ্চল ব্যাপ্ত অভাবে বিতরণ করার জন্য সরকার রেঙ্গুনী চাল কিনে

জনসাধারণের মাঝে নগদ ও ঋণ হিসাবে বিতরণ করার জন্য আশি হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। মাতামুহুরী, শঙ্খ, কর্ণফুলী, চেঙ্গী কাচালং ইত্যাদি উপত্যকা অঞ্চলে বহু খাদ্য গুদাম খোলা হয়। অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খয়রাতী সাহায্যও বিতরিত হয়। খ্রীষ্টীয় বেপ্টিষ্ট মিশন চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের চাল ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। চাকমা রাজা ও পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের চাল ঋণ হিসেবে বন্টন করেন। কোন উপজাতীয় সর্দারের ওটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কাজ।
ঐ অভাব ও দুর্ভিক্ষে প্রাণহানি স্বীকৃত না হলেও, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের দ্বারা সৃষ্ট পেটের অসুখে বহু লোকের প্রাণনাশ ও অসংখ্য লোক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। এটা বৃদ্ধ ও শিশুদের পক্ষে অধিক মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এই সাথে ইদুঁরের উৎপাতে কৃষি ও খাদ্যশস্য ভীষণ ক্ষতির কবলে পড়ে। অনুরূপ প্রথম ঘটনা ঘটেছিলো ১৮৬৪ সালে। তখন সাজেকসহ গোটা উত্তরাঞ্চল ছিলো ইদুর বন্যার শিকার। কৃষিক্ষেত্রসহ বাগান, বাড়ী-ঘর, গুদামের যাবতীয় কিছুই তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

মিঃ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার স্বীয় পুস্তক দি স্টেটিষ্টিকেল একাউন্ট অফ বেঙ্গলে উনবিংশ শতাব্দীতে এতদাঞ্চলের উপজাতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নকারে বর্ণনা করেছেন ঃ

'সর্দার ও কিছু হেডম্যান বাদে সাধারণ লোকজনের সবাই দরিদ্র। তারা নিজেদের পাড়ার নিকটবর্তী পাহাড় ও বনে তার শেষ ভূমি খন্ডটির ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত, জুম চাষ করে। অতঃপর নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। ফসল উৎপাদনে মন্দা দেখা দিলে তারা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে এই আশায় যে আগামীতে ভাল ফসল হবে এবং তাতে ঋণ হাওলাত শোধ করা যাবে। নৌকা, কাঠ অথবা বাঁশ সরবরাহের দ্বারাও ঋণ হাওলাত শোধ করা হয়। পাহাড়ী লোকেরা বিশেষতঃ মগ ও ত্রিপুরারা মদের প্রতি অধিক আসক্ত। ১৮৭০ সালে জেলা প্রশাসক বলেছেন, তিনি সতর্ক অনুসন্ধানের দ্বারা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে একজন পাহাড়ীর অন্ততঃ অর্ধেক আয় রোজগার মদের পিছনেই ব্যয় হয়ে যায়।'

চট্টগ্রাম ডিভিশনের মাননীয় কমিশনার ১৯১৭ সালে স্বীয় প্রতবিদেনে উল্লেখ করেন ঃ 'পাহাড়ী লোকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এবং তা প্রতিবছর অধিকতর মন্দই হচ্ছে। একজন পর্যটককে প্রথমে যে জিনিসটি পীড়া দিবে, তা হলো সাধারণ লোকের ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য। ১৮৯১ সালের পর থেকে প্রতি বছর কষ্টের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।
ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন। ১৮৬৯ সালে জুমিয়াদের আয় রোজগারের নিম্নোক্ত হিসাব প্রদান করেছেন ঃ

'সাধারণতঃ একটি জুমিয়া পরিবার প্রায় ৯ কানি বা ৩.৬০ একর জমি নিয়ে জুম করে। তাতে গড়ে ৭২ মন ধান, ১২ মন তুলা, এ ছাড়াও তরিতরকারী তিল ইত্যাদি

উৎপন্ন হয়। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যময় ভোগের জন্য ৪০ মন ধান প্রয়োজনীয়। বাকি ৩২ মন বিক্রয়যোগ্য। দু'মন তুলা পারিবারিক ব্যবহারে লাগে। ১০ মন বিক্রির জন্য থাকে। তিলাদি ও তরিতরকারীর বিক্রয়মূল্য সহ ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে উদ্বৃত্ত ধান ও তুলা থেকে তার আয় হয় ৭০ থেকে ৮০ টাকা।'

'এই কৃষি কাজের অতিরিক্ত একজন জুমিয়া নিকটবর্তী খাস বন থেকে বাঁশ গাছ, লতা, লাকড়ি, ইত্যাদি বনজ পণ্য সংগ্রহ করে নিকটবর্তী বাজারে অথবা বেপারীদের নিকট বিক্রি করে তার আয় বাড়াতে পারে। তবে ঘরে ফসল তোলার পর তারা প্রায় অলস ভোগ ও মদ খেয়ে কাটায়। সঞ্চয়, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা লাঙ্গল কৃষির প্রতি তারা উদাসীন।' লুইন সাহেব স্বীয় পুস্তকে আরো মন্তব্য করেছেনঃ

(ক) 'সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের কোনখানে এমন কোন পাহাড়ী লোকের সন্ধান আমি পাইনি, যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে। প্রকৃতপক্ষে জুম চাষ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এমন ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়। কতিপয় সর্দার মাতবরের গ্রামের কাছে কখনো সখনো কয়েক একর লাঙ্গল চাষের জমি লক্ষ্য করা যায়। তবে তারা তা দেখা শোনা করার জন্য বাঙ্গালী চাষী নিযুক্ত করে থাকেন।'

(খ) 'একজন উপজাতীয় চাষী সমতল ভূমিতে চাষ করাকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী মনে করে। সমতল ভূমির চাষীএকজোড়া মহিষের লেজে নাড়া দিয়ে স্বীয় ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে কড়া রোদের দুপুরে, ও হাটু সমান কাদায় ডুবে কাজ করে যায়। মাঠের ভিতর কোন গাছ বা আচ্ছাদন থাকে না, যার ছায়ায় মধ্যাহ্নের খাঁ খাঁ রোদে কিছুক্ষণের জন্য হলেও জিরাতে পারে। তার চতুরপার্শে থাকে শুধুই বিস্তৃত কর্দমাক্ত জমি। তাদের স্ত্রীরা তখন ঘরে হিংস্র জন্তু জানোয়ার পরিবেষ্টিত পরিবেশে আবদ্ধ থাকে। এর মধ্যে চাষীটি যদি তার মহ্যাহ্নের খাবার যোগাড় থাকে, তবে তা কর্মমাক্ত লাঙ্গলের পাশে বসেই গ্রহণ করে। তাই সমতল ভূমির চাষের চেয়ে, একজন পাহাড়ী দিনে দু'টাকা রোজগার করলেও তা হয় তার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। এতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই। পাহাড়ীরা তাদের জীবন যাত্রার প্রতি খুবই আবেগপ্রবণ। এবং তারা স্বাভাবিক বন্য জীবন যাত্রার বিপরীতে সমতল ভূমির জীবন যাত্রা প্রণালীকে মনে করে এক ঘেয়ে, যা অবলম্বন করাকে তারা অপছন্দ করে। (সূত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এণ্ড দি ডোয়েলার্স দেয়ার ইন)

•

১৮৬৫ সালে প্রণীত ও জারিকৃত বন সংরক্ষণ আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের দ্বারা জুম কৃষি থেকে পাহাড়ীদের বিরত না করে, হাল কৃষি গ্রহণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ শুরু হয়। আসলে হালকৃষি হলো অধিক লাভজনক। তাতে পরিবেশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তদ্বারা লোকজন স্থায়ী পাড়া জীবন-যাপনের সুযোগও পায়। বন্দোবস্ত গ্রহণের দ্বারা তাতে জমির ব্যবহার ও মালিকানা স্থায়ী হয়। বাগান ও সব্জি ক্ষেত গড়ে তোলা যায়, যা হয় বাড়তি আয় ও আয়েশের উৎস। স্থায়ী পাড়া জীবনে শিক্ষা লাভ, স্বাস্থ্য সুবিধা ভোগ, বিনোদনমূলক সংস্কৃতির চর্চা, আয়েশমুলক আবাসন ও

শিল্প সুবিধা নিহিত থাকে, যা একজন জুমিয়ার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সুখী ও সভ্য জীবনের বাহন হলো প্রথমতঃ ভূমি বন্দোবস্তি লাভ ও হালকৃষি অবলম্বন। সরকার এই ব্যবস্থাটি উপজাতিদের মাঝে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ ভূমি বন্দোবস্তি সহজতর করেন। মৌজা প্রধানদের ভূমি পত্তনের ক্ষমতা দেয়া হয়। প্রথম তিন বছরের জন্য জমি গ্রহীতারা খাজনা মুক্ত হোন। জমির দখল ও আবাদের সুবাদে তৎপর জেলা প্রশাসক এবং মহকুমা প্রমাসকেরা প্রথম শ্রেণীব কৃষি জমির জন্য একর প্রতি তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দু'টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য এক টাকা খাজনা ধার্য্য করে, অতি সহজ পদ্ধতিতে বন্দোবস্তি বা ইজারা প্রদান করেন। এই ব্যবস্থাও জুমিয়াদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলে, হাল কৃষিতে তারা অনভিজ্ঞ বলে, সরকারী ব্যয়ে বাঙ্গালী কৃষক নিযুক্ত করে, হাল কৃষি শিক্ষাদান ও পাশাপাশি বীজ, পুঁজি, হালের বলদ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের সরকারী উদ্যোগ গৃহীত হয়। তবু এটা বাঞ্ছিত সুফল দানে ব্যর্থ হয়। হালকৃষি সীমিতভাবে শুরু হলেও, সর্দার ও মাতবরদের উৎসাহে জুম কৃষিটিও অব্যাহত থাকে। কারণ সর্দার ও মাতবরদের আয়ও পদবিগত মর্যাদা জুম কৃষির সাথে জড়িত, এবং উপজাতীয় সমাজও সার্বিকভাবে তাদের দ্বারা পরিচালিত। তবে প্রকৃতিগত কারণেও লোক বৃদ্ধির ফলে জুম কৃষি হ্রাস পায়, এবং একই ভূমিতে বারবার চাষ ও সার প্রয়োগের দ্বারা বাড়তি খাদ্য ফলানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতে হালকৃষি অবলম্বন ছাড়া উপায় থাকে না। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ধীরে ধীরে হাল কৃষির যুগ শুরু হয়ে যায়। এ কাজে তাদের গুরু হলো ঐসব বাঙ্গালী, যারা লুসাই অভিযানকালে কুলি হিসেবে আনিত, সরকার কর্তৃক চাষ শিক্ষাদানে নিযুক্ত, এবং সর্দার ও মৌজা প্রধানদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত খামারে বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে চাকুরী প্রাপ্ত হয়েছিলো। এটা ছাড়াও সৌখিন খামারী ও ভাগ্যান্বেষী চাষী হিসেবে সর্দার ও হেডম্যানদের অনুমোদন ও উৎসাহে অনেক বাঙ্গালী কৃষিকাজ ও ভূমি আবাদে নিযুক্ত হয়। প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের সময় ও বাঙ্গালীরা ভূমি বন্দোবস্তি ও ইজারা লাভ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ

'খামারে স্বাধীন উপজাতিদের আক্রমণের ভয় থাকায় এ পর্যন্ত বাঙ্গালীরা এ জেলার বিস্তৃত সমতল ভূমি অধিকার করে চাষাবাদ করার সাহস পায়নি। তবে সম্প্রতি একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে, এবং গত দু'বছর ধরে এ জেলার চট্টগ্রাম সীমান্তের অনেক জমি সমতলবাসীদের কাছে ইজারা দেয়া হচ্ছে। (সূত্র ঐ)

মিঃ পিয়ের বেসানেত বলেন ঃ 'লাঙ্গল পদ্ধতির চাষ পাহাড়ীদের নিজস্ব নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উপজাতীয় রাজারা বাঙ্গালীদেরকে পাহাড়ের নিম্নাংশের যেখানে সেচ করা সম্ভব, সে সব জায়গায় বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ করে আনেন এবং তারাই হাল কৃষির প্রবর্তন করে। ওদের বংশধরেরা এখনো ঐ সব জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু তাদেরকে পাহাড়ী না বলে সমতলবাসী বলা হয়ে থাকে।.....প্রায় দেড় শত বছরের মধ্যে অনেক পাহাড়ী লোকই তাদের কাছ থেকে

চাষে লাঙ্গল ব্যবহারের কৌশল শিখে নিয়েছে। (সুত্র ঃ ট্রাইবসম্যান অফ দি চিটাগাং হিলট্রাক্টস)

আজকাল উপজাতিদের আয় রোজগারের সম্প্রসারিত সুত্র হলোঃ কৃষি ব্যবসা ও চাকুরী।

নাইট কুইনের মেলা

চাকমা সহ উপজাতীয় বহিরাগমন।

প্রমাণ নং-১।

রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত প্রত্ন নিদর্শন, রাজা শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীলমোহর, যার ভাষ্য হলো : "রোসান, আরাকান, আল্লাহ রাব্বি, ১১১১ শের জব্বার খান।" যদ্বারা বুঝা যায়, ঐ রাজার সময়কালে চাকমারা আরাকানের রোসাং অঞ্চলবাসী ছিলেন। তাঁর সর্দারীকাল, ঐ সীলমোহর অনুযায়ী ১১১১ মঘী মোতাবেক ১৭৪৯ খ্রী: সালে শুরু। বিভিন্ন বিবরণে ১৭৬৫ খ্রী: সালে তাঁর মৃত্যু ও পুত্র নূরুল্লা খান ক্ষমতাসীন হয়েছেন বলে জানা যায়। ঐ সালটিতে চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত এতদাঞ্চলে পরিপূর্ণ বৃটিশ শাসনের সূচনা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য ৯ম খণ্ডে প্রদত্ত সীলমোহরের ছাপ চিত্র।

প্রমাণ নং-২।

আদি চাকমা রাজা বলে খ্যাত জনৈক শের মস্ত খাঁ, কিছু চাকমা অনুসারীসহ চট্টগ্রামের মোগল নাজিম জুল কদর খাঁনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৭৩৭ খ্রী: সালে কোদালা উপত্যকায় পুনর্বাসিত হোন। তিনিও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন আরাকানত্যাগী উদ্বাস্তু। তাঁর ঐ দেশত্যাগ ও অভিবাসনের কথা অধ্যাপক এ. এম. সিরাজুদ্দিন "অরিজিন ওফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিলট্রাক্টস" নামীয় একটি গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তার আরো আগে ১৭১১ খ্রী: সালে আরাকানত্যাগী চন্দন খাঁ, দক্ষিণ-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর শেষ বংশধর জালাল খাঁ ১৭২৪ সালে মোগলদের দ্বারা অবাধ্যতার অপরাধে দলবলসহ আক্রান্ত ও বিতাড়িত হোন। ওদের সাথে চাকমাদের রক্তগত সম্পর্ক থাকা সমর্থিত নয়। ওদের কথাও অধ্যাপক এ. এম. সিরাজুদ্দিন সাহেবের প্রবন্ধে উল্লেখিত আছে। সূত্র : জার্নাল অফ দি পাকিস্তান হিস্টোরিকেল সোসাইটি করাচি ভলিউম XIX Part-1 জানুয়ারি ১৯৭১। এই তথ্য সমর্থন করে রাণী কালিন্দির দেওয়াল লিপি ও একটি চাকমার লৌকগীতি যাতে শেরমস্ত খাঁ আদি রাজা বলে স্বীকৃত।

প্রমাণ নং-৩।

চাকমাদের বহুল চর্চিত ঐ লোকগীতিতেও গর্বের সাথে স্বীকার করা হয় যে, তাদের পূর্ববর্তী বাসস্থানগুলোর একটি হলো আরাকানের রোসাং, যথা : চাকমা লোকগীতি:

ক) আদি রাজা শের মস্ত খাঁ, রোয়াং ছিলো বাড়ী,

তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জামদারী।"

তাদের আরেক স্বদেশভূমি হলো : অখ্যাত অজ্ঞাত এক চম্পক নগর, যথা : লোকগীতি:

খ) "এলে মৈসাং লালচ নেই

ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই

চল ভেই লোগ চল যেই

চম্পক নগর ফিরি যেই।"

প্রমাণ নং-৪।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি, এইচ লুইনকে, এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করা হয়ে থাকে। তিনি স্বীয় পুস্তক "দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন"-এর ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন :

A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hills, undoubtedly came about two generations ago from Arracan. This is assurted both by their own traditions and by records in the Chittagong collectorate. It was in some measure due to the erodus of hill tribes from Arracan, that the Burmese war of 1824 took place, which ended in annexation to British territory, of the fertile province of Arracan. As this is a point interesting, not only from its local bearing on the hill tribes, but also in a larger and more important historical sense, I shall trace here the way in which the dissensions between the English authorities and Burmese, which eventually culminated in war, hinged in a great measure upon refugees, from the hill tribes, who fleeing from Arracan into our territory, were pursued and demanded at our hands by the Burmese. Among the earliest records that we have of our dealings with the Burmese, are two letters, written, one by the King of Burmah, ant the other by the Rajah of Arracan, to the Chief of Chittagong, and received about the 24th June 1787.

বাংলা : "উপজাতীয়দের যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে বসবাস করছে, তাদের অধিকাংশ প্রায় দু'পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐসব দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত, যা চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। আরাকান থেকে উপজাতীয়

লোকজনের পলায়ন হলো অন্যতম কারণ যদরুণ ১৮২৪ খ্রীঃ সালের বর্মা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, যেটি বৃটিশ ভারতের সাথে উর্বর আরাকান প্রদেশের সংযুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ঘটনাটি শুধু স্থানীয় পাহাড়ী উপজাতিগুলোর কারণেই নয়, বরং আরো গুরুতর ও ঐতিহাসিক কার্যকারণেও হৃদয়গ্রাহী। আমি এখানে সে ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করতে চাই, যদ্দরুণ বৃটিশ ও বর্মী কর্তৃপক্ষের মাঝে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, ও যুদ্ধের পরিণতি লাভ করে, আর তা হলো, পাহাড়ী উপজাতিদের বিপুল সংখ্যায় আরাকান ত্যাগ, ও আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ, যাদেরকে অনুসরণ ও ফেরৎ চেয়ে বর্মী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ ও দাবী উত্থাপন করেন।

বর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সর্বাধিক প্রাচীন দলিল হলো দু'টি চিঠি, যার একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক এবং অপরটি আরাকানের রাজা কর্তৃক, আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিত হয়, যা সম্ভবত ঃ ২৪ শে জুন ১৭৮৭ খ্রীঃ তারিখে পাওয়া যায়। (সুত্র ঃ দি হিলট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন, পৃঃ ২৮/২৯)

মিঃ লুইন অতঃপর আরাকানের রাজার চিঠিখানার পরিপূর্ণ ইংলিশ ভাষ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরে পুনরায় বলেন ঃ

This letter is explicit enough. The fugitives referred to are evidently men of the Chuckma and Mrung hill tribes, who to this day preserve the recollection of their ancestor's flight from Arracan. The persons in question were probably the chiefs of the clans, and the driving of them from British territory would have been equivalent to the expulsion of the whole clan.(Ref: do page 29)

বাংলা ঃ এই চিঠিখানা যথেষ্ট বিশদ। বর্ণিত পলাতকেরা প্রমাণিতভাবে পাহাড়ী উপজাতীয় চাকমা ও মুরং সম্প্রদায়ের লোক, যারা এখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের আরাকান ত্যাগের স্মৃতিকথা ধারণ করে আছে। বিতর্কিত ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ তাদের দলপতি, যাদেরকে বৃটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বিতাড়ণের অর্থ গোটা সম্প্রদায়কেই বিতাড়ণ।(সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)

প্রমাণ নং-৫।

১৭৮৭ খ্রীঃ সালের জুন মাসে, চট্টগ্রামের বৃটিশ শাসককে লিখিত আরাকানের রাজার চিঠি, যথা ঃ

From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our territories are composed of five hundred and sixty countries and we have ever been on terms of friendship. The inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries

belonging to us. A person named Keoty having absconded from our country. took refuge in yours. I did ont however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possessions refused to sent him to me. I also am possessed of extensive country and keoty in consequence of his disobedient conduct and the strength and influence of my king's good fortune was destroyed.

``Domcan, Chukma and Kiecopa, lies, Marring and other inhabitants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishman at the mouth of the Naf, and stole away everything he had with him. Hearing of this I am come to your boundaries with an army in order to sieze them, because they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robbers, It is not proper that you should give asylum to them or the other Moghs who have absconded from Arracan and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may secured. If you do not drive them from your country and give them up, I shall be under the necessity of seeking them out with an army, in whatever part of your territories they may be. I send this letter by Mohammed wassene. Upon the receipt of it. either drive the Moghs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer immediately." (Page : 29)

বাংলা ঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের উদ্দেশ্যে ঃ

আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের দেশসমূহের অধিবাসীদের সাথে স্বেচ্ছায় আর অবাধে অন্যান্য দেশবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। কেওটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে ধাওয়া করছি না, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছি, এই আশায় যে, কেওটিকে ধরে অবশ্যই আমার হাতে তুরে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি তার অবাধ্য আচরণ আর আমার

রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাবগুণে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডোমকান, চাকমা, কায়কোপা, লাইচ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে, এবং উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা নাফ নদীর মোহ-নায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে, তার যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এটি শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু তারা নিজেদের স্বদেশত্যাগ করেছে আমার রাজার প্রতি অবাধ্য এবং দস্যু বৃত্তিতে লিপ্ত, সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও, যারা আরাকান থেকে পালিয়ে গেছে, আশ্রয়দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচীন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে, এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান, ও ধরে হস্তান্তর না করেন, তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানেই তারা থাকুক না কেন, একদল সৈন্য নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠালাম। এটি বুঝে পেয়ে হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, অথবা তাদেরকে আশ্রয় দিবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র প্রত্যুত্তরে জানাবেন।'

(সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)

<u>প্রমাণ নং-৬।</u>

১৭৮৪ খ্রীঃ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক, আরাকান রাজ্য দখল ও তথায় অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের ফলে সে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী নিরাপদ আশ্রযের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসে। তখন উদ্বাস্তু আরাকানীরা স্বদেশ উদ্ধারের জন্য অভিযানও চালাতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত আভা সরকার ও বিদ্রোহী আরাকানীদের মাঝে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষগুলো উদ্বাস্তু আগমনকে আরো বাড়িয়ে তুলে, এবং তাতে বার্মা ও বৃটিশ উভয় সরকারের মাঝে তিক্ততা চরম আকার ধারণ করে। ঐ সালেই উভয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং আরাকান বৃটিশদের দখলিভূত হয়ে, ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। তখনকার ঐ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আরাকানীদের দীর্ঘ অবস্থানের কারণে, আশ্রয়দাতা দেশই তাদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালীরা পটুয়াখালীর মগ ও কক্সবাজারের রাখাইনরা, সেই তাদেরই বংশধর। চাকমারাও সেই উদ্বাস্তুদের একটি অংশ।

ক) মিঃ লুইন ঐ ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন যথা ঃ

These letters were recived during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the Sirdar of Arracan. The Chief of Chittagong in the same month of iune. writes to the Governor General in Council,

reporting this incursion and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance until this armed force was withderwn. At the same time he states that in his opinion the refugees should be driven out of British territory. He adds also that these fugitives were persons of some consequence in Arracan, and reports, further that a chakma Sirdar who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by stating his opinion that this Sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jungles for the convenience of plundeing. Ten years before this in the year 1777, it appears from a letter dated 31st May, from the Chief of Chittagong to the Honourable Warren Hastings Governor General that some thousands of hill men had come from Arracan into the Chittagong limits, having been offered encouragement to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and (Macfarlane's History of British India, page 355,) records that in 1795 a Burmese army of 5,000 men again pursued some rebellious chiefs or as they called them robbers right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and two out of the three were put to death with atrocius tortures.

In 1809 Macfarlane records that disputes continued to occur in the frontiers of chittagong and Tipperah but the organized forays into that territory hardly assumed any narrative definit form until 1823 (Wilson's The Narrative of tht Burmese War page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824. The primary cause, there fore, of all these disturbence, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtedly the emigraion to our hill tribes hitherto subject to their authority.

The origin of The tribes is a doubtful point. Pemberton ascribes them a Maloy descent. Colonel Sir A. Phayre considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of Myamma or Burmese extraction. Among the tribes

তাতে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুরুসুগিরি তথা মইসাগিরি বা মইসাং ও তার সাথে সম্পর্কিত চাকমা ও অন্যান্য জনসাধারণের মৌলিক আবাসক্ষেত্র বাংলাদেশ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি কালের কাছাকাছি সময় কালেও যখন বৃটিশ শাসনের চার দশক সময়কাল প্রায় অতিবাহিত, তখনো বাংলাদেশ অঞ্চলে চাকমাদের আগমন নির্গমন অব্যাহত ছিলো। অতএব এটা সন্দেহাতীত যে, চাকমা ও তাদের সঙ্গী সাথী উপজাতিরা আসলে বিদেশী বংশোদ্ভুত, যাদের অন্যতম আবাসস্থল হলো আরাকানের মুরুসুগিরি বা মৎস্যগিরি অঞ্চল। গিরি পদবিটিও তাদের প্রাচীন রাজা বিজয়গিরি সূত্রে প্রাপ্ত।

প্রমাণ নং-৭।

১৫৫০ খ্রীঃ সালে অংকিত বাংলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের একটি প্রাচীন মানচিত্রে পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও দে বারোজ একটি চাকোমা নামীয় অঞ্চল প্রদর্শন করেছেন, যা রাইংখ্যং ও সুবলং উপনদী দুটির উৎস অঞ্চলের পূর্বে চীন পাহাড় এলাকায় অবস্থিত। তাতেও প্রমাণিত হয়, উত্তর আরাকানে চাকমাদের আবাসভূমি ছিলো। (সুত্র ঃ দি ম্যাপ অফ জুয়াও দে বারোজ ডেটেড এবাউট ১৫৫০ খ্রীঃ ডঃ আব্দুল করিম, জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৩ ভলিউম-VIII নং-২)

প্রমাণ নং-৮।

আরাকানের মগদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েই চাকমারা এতদাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে এটা তাদের লোকগীতির দ্বারাও সমর্থিত, যথাঃ

তৌনে রানি নি ভাত খেলাক

সমুন্দর সাগর নি লাগ পেলাক

লই নেই সমারে সৈন্য গণ

রোয়াং কুলে লুঙ্গে গৈ রাধা মন

বর্জিত বাজিল ধল বাছা

মগ রাজা কত্তে এলো কোন রাজা

কয় মগ রাজা রাধারে

রেজ্য গঝেই দেঙোর তোয়ারে

সূত্র ঃ রাধা মোহন ধন পতির পালা

প্রমাণ নং-৯।

বৃটিশ সরকার সর্বপ্রথম ১৯০০ খ্রীঃ সালে আইনের দ্বারা অধিকাংশ বহিরাগত অবাঙ্গালীর রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে, এতদাঞ্চলে তাদেরকে অভিবাসী বলে ঘোষণা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারাই তার প্রমাণ, যথা ঃ

Immigration in to the Hill tracts.

Save as here in after provided, no person other than a Chakma, Mogh or a member of any hill tribe, indigenous to the Chittagong. Hill tracts, the lushai hills, the Aracan hill tracts, or the State of Tripura, shall enter or reside within the Chittagong Hill tracts, unless he is in possesion of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion.

বাংলা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন।

নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী থাকা ব্যতিরেকে চাকমা মগ অথবা এমন কোন পাহাড়ী উপজাতীয় সদস্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড়, পার্বত্য আরাকান অঞ্চল অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী বাসিন্দা, এমন লোক ব্যতীত অপর কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ অথবা বসবাস করতে পারবেনা, যদি না তার অধিকারে জেলা প্রশাসকের বিবেচনা প্রদত্ত কোন অনুমতি পত্র থাকে।

এই আইনে চাকমা ও মগদের উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী বলা হয়নি।তারা বিদেশাগত বাসিন্দা তথা অভিবাসী। লুসাই ত্রিপুরা আর অন্যান্য আরাকানীরাও স্থানীয় অধিবাসী নয়, নামেই তারা বিদেশী পরিচিত। এসবের প্রতি স্থানীয় উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ীজ্ঞাপক সংজ্ঞার প্রয়োগ এক প্রচলিত বিভ্রান্তি। ত্রিপুরাবাসী, লুসাইবাসী ও আরাকানবাসী উপজাতিদের স্ব-স্ব অঞ্চলের পাহাড়ী আদিবাসী বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়। চাকমা ও মগেরা স্থানীয় নামহীন আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

প্রমাণ নং-১০।

The tribes consider themselve decendents of emigrants from Bihar, who came over and settled in this parts in the days of the Arakanies king.

(Ref: An Accoun of Chitagong Hill Tracts. by S. H. Hutchinson, page-89)

বাংলা ঃ এই উপজাতীয় লোকজন নিজেদেরকে দেশত্যাগী ঐ সব বিহারবাসীদের বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখন্ডে আরাকানী রাজাদের শাসনকালে আবাস স্থাপন করেছে। (সুত্র ঃ এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ঃ এস এইচ, হাচিনসন, পৃঃ৮৯)

প্রমাণ নং-১১।

চাকমা রাজা মাননীয় ভুবন মোহন রায় স্বীয় পুস্তিকা 'চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস''-এ উল্লেখ করেছেন ঃ চাকমাদের প্রথম রাজ্য হলো নেপালের নিকটকার হিমালয় পাদদেশভুক্ত কল্প নগর। দ্বিতীয় রাজ্য ও রাজধানী হলো ইরাবতী নদী তীরবর্তী উজানের চম্পক নগর এবং তৃতীয় রাজ্য হলো বার্মার অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ, যেখান থেকে মগ অত্যাচার ও বিতাড়নহেতু বাংলাদেশ অঞ্চলে তাদের আগমন ঘটেছে।

প্রমাণ নং-১২।

চাকমা লোকগীতি ঃ চাটিগাং ছড়া/ছাড়া পালা ও রাধা মোহন ধনপতির পালাতে ও নিম্নাকারে তাদের আরাকান অভিযান ও রাজ্য জয়ের বর্ণনা আছে, যথা ঃ

ক) চাকমা ভাষ্য ঃ

তৌনে রানি নি ভাত খেলাক,

সমুন্দর সাগর নি লাগ পেলাক।

লৈ নেই সমারে সৈন্যগণ,

রোয়াং কূলে লুঙ্গেগে রাধা মো'ন।

বর্জিত বাজিল ধল বাচা,

মগ রাজা কত্তে এলো কন রাজা?

রাধা মোনর ছাস ডাঙর

আস্তে আস্তে মগ রেজ্য মারি লর।

মগে গত্তন হাহাগার,

চাঙমায় গত্তন মগেরে অনাচার।

কয় মগ রাজা রাধারে

রেজ্য গজেই দেঙগর তোয়ারে।

গয়া গঙ্গা গর লুং দান,

চাঙে তোত্তন পরাণ নান।

সুত্র ঃ (১) রাধা মোহন ধনপতির পালা (২) চাকমা জাতি ঃ সতীশ ঘোষ।

খ) বাংলা ভাষ্য ঃ

তরকারী রেঁধে ভাত খেলে,

সমুদ্রসাগর লাগ পেলে।

সঙ্গে নিয়ে সৈন্যগণ,

রোয়াং কূলে পৌছে গেল রাধামোহন।

বর্শিতে বিধেছে ধলা বাচা,

মগ রাজা কয় এলো কোন রাজা?

রাধা মো'ন বাড়ন্ত সাহসে,

মগ রাজ্য জয় করে নেয় শেষে।

করছে মগেরা হাহাকার,

চাকমা করছে মগ উপর অনাচার।

কয় মগ রাজা রাধারে

রাজ্য গছিয়ে দিচ্ছি তোমারে।

গয়া গঙ্গা করলাম দান

চাই তোমার কাছে পরাণ খান।

সূত্র ঃ (১) রাধা মোহন ধনপতির পালা

(২) চাকমা জাতি ঃ সতীশ ঘোষ।

প্রমাণ নং-১৩।

চাকমা বৈদ্য মহলে একটি স্বতন্ত্র বর্ণমালার চর্চা হয়, যে বর্ণমালাকে সাধারণতঃ চাকমা বর্ণ বলা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞজনদের বর্ণনা মতে, এটি খেমার বর্ণ, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত। কোন কোন পন্ডিতমনে করেন, এ বর্ণ মালাটি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাম্মী লিপিরই একটি সংস্করণ। এতেও প্রমাণিত হয়, চাকমারা চট্টগ্রামী মূলের লোকসমষ্টি নয়, তারা বহিরাগত।

প্রমাণ নং-১৪।

চাকমা ভাষা বহুল পরিমাণে হিন্দী প্রভাবিত, যথা ঃ হিন্দী ক্রিয়াপদ ঃ যায়েঙ্গে, চাকমা ক্রিয়াপদ ঃ যেবোংগে। হিন্দী বিশেষ্যঃ লোগ, চাকমা বিশেষ্যঃ লোগ। হিন্দী বহুবচন ঃ হাম, হামি, চাকমা বহুবচন ঃ আমি। হিন্দী বহুবচন ঃ তুম, তুমহি, চাকমা বহুবচন ঃ

তুমি ইত্যাদি। এটাও তাদের বর্হিদেশীয় হওয়ার প্রমাণ। এই সুত্রে প্রশ্ন ওঠে ঃ তাদের আদি বাসস্থান আরাকান না বিহার? এ দুয়ে সামঞ্জস্য নেই। এর উত্তর হলো, অতীতে চাকমারা মগ অঞ্চলের বাসিন্দাই ছিলো। 'মগধা' তাদের ব্যবহৃত কটুবাক্য হওয়ায় ভাবা যায়, কোন এককালে মগধবাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হয়ে প্রথম থেকে সপ্তম শতাব্দী কালের মধ্যে ভারতীয় ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশকারীদের সাথে তারাও আরাকানবাসী হয়েছে। এই অর্থে তারা ও এহুদীদের মত প্রাচীন উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী।

<u>প্রমাণ নং-১৫।</u>

মাতামুহুরী উপত্যকা অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত ও শাসনভুক্ত এলাকা ছিলো। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেকাংশ প্রথমে ১৩৩৯-৪০ খ্রীঃ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ কর্তৃক বিজিত হয়। আরেকবার ১৫১২ খ্রীঃ সালে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এতদাঞ্চল দখল করেন। তারই নিযুক্ত অন্যতম স্থানীয় শাসক ছিলেন জনৈক খোদা বখশ খান, যার শাসনাধীন এলাকা ছিলো আলীকদম সহ দক্ষিণ চট্টগ্রাম। চাকমাদের দাবী হলো ঃ ঐ আলীকদম ছিলো এককালে তাদের রাজ্য বা রাজধানী। শ্রুতি কথায় ব্যক্ত আছে ঃ কথিত আলী কদমেরই নিকটকার তৈনছড়ির তীরে একদা চাকমাদের রাজা নির্বাচন পালা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাঁশ বেতের দ্বারা প্রস্তুত একটি সিংহাসনে রাজা ধাবানা আসন গ্রহণ করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী পীড়াভাঙ্গা তাড়াহুড়ার ভিতর স্ত্রীর বক্ষ বন্ধণীতে পাগড়ী বাঁধায় আযোগ্য ঘোষিত হোন। কিংবদন্তি আছে, নীচে বাঁকখালির পারে অবস্থিত চাকমা কুল, রাজা কুল ও দক্ষিণের ঝলোংঝা অঞ্চলটি, তাদেরই সম্প্রসারিত আধিপত্যের স্মারক।

বাংলাদেশের আদিবাসী ও উপজাতি।

এটা নিঃসন্দেহ যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসী উপজাতিদের অধিকাংশ আরাকানী শরণার্থীদের বংশোদ্ভূত লোক, এদেশের আদি অধিবাসী নয়, এবং তাই তাদের জাতীয়তা আদি বাংলাদেশী হওয়া বিতর্কিত। উপজাতি সমুহের আগমন নির্গমন ও বসবাসের মৌলিক তথ্য তাদের সংরক্ষিত কিছু দলিল প্রমাণ নির্দশন ও চর্চিত গানের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তাতেও সমর্থন মিলে যে, তাদের অধিকাংশ বার্মা ও আরাকান থেকে আগত, এবং অবশিষ্টরা আসাম ও ত্রিপুরার অধিবাসী, যারা শরণার্থী ও প্রবাসী থাকা অবস্থায়, বংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা। এই লোকজন এ যাবৎ অস্থানীয় আর বিদেশী বলে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হওয়ায়, ধারণাগতভাবে তাদের নাগরিকত্বের বিতর্ক চাপা পড়ে গেছে। তাই নতুন প্রজন্মের উপজাতি আর বাঙ্গালীরা ও বটে, স্ব স্ব মৌকিত্বকে ভুলে আছে। উপজাতি সংক্রান্ত এতদাঞ্চলের প্রামাণ্য অতীত ঘটনাবলী গ্রন্থনা ও চর্চার অভাবে মারাত্মক তথ্য শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। যদ্দরুণ জ্ঞানী গুণী, সাধারণ আর সরকারী কর্তকর্তা কর্মচারীরাও বটে, এতদাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের স্থানীয় আদিবাসী নাগরিক হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এই ভুল মূল্যায়নের ভিত্তিতেই উপজাতিরা বৈষম্য আর উৎপীড়ণের অভিযোগ উত্থাপনসহ, স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে সোচ্চার। অথচ অবিতর্কিত স্থায়ী নাগরিকদের পক্ষেই কেবল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দাবী উত্থাপন করা সম্ভব। প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিদের জাতীয়তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশী নয়। আনুত্যহীনতার কারণে বিহারী মুসলমানেরা বাংলাদেশে বিদেশী ঘোষিত। ঠিক অনুরূপভাবে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিরা, রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহী হওয়ার কারণে, আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার অযোগ্য। তারা বিদেশী ঘোষিত হলে, আপত্তি করার কিছুই থাকে না

খালেদা সরকার (১৯৯১-৯৬) দাবী করেছেন বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। এর বিপরীতে একদল অবাঙ্গালী সংখ্যালঘু নিজেদের আদিবাসী দাবী করে ১৯৯৪ সালকে জাতিসংঘের ঘোষিত আদিবাসী বর্ষ হিসেবে পালন ও সম্মেলন করেছেন। আবারও তজ্জন্য প্রস্তুতি চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকের আলোচনায় স্থানীয় অবাঙ্গালী সংখ্যালঘুদের ঢালাও ভাবে হয় উপজাতি না হয় আদিবাসী আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তাত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের বিচারে এ বিতর্কটির মীমাংসা টানা আবশ্যক, নতুবা বিভ্রান্তির অবসান হবে না। এটা নিশ্চিত নয় যে আদিবাসী আর উপজাতি সংজ্ঞাটি কে কোন অর্থে ব্যবহার করছেন। এটা তাত্বিক বা শাব্দিক এ দুস্বসূত্রের যে কোন একক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, এক সাথে দ্বৈত অর্থে নয়। তাত্বিক অর্থের আদিবাসী আর উপজাতি বাংলাদেশে আছে কি নেই, তা এখনো অবশ্যই গবেষণা ও মীমাংসা সাপেক্ষ বিষয়। নৃতাত্বিক পাশ্চাত্য পন্ডিত অধ্যাপক পিয়ের বেসানেত, স্বীয় বিখ্যাত পুস্তক ট্রাইবস অফ চিটাগাং হিল ট্রাকাট্স-এর শুরুতেই মন্তব্য করেছেন ঃ

(ক) আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছি। যে সব লোক সভ্যতার প্রভাব হতে দূরে সরে আছে স্বাভাবিকভাবে এই নৃতত্ত্ব নীতি তাদের উপরই প্রযোজ্য। (সূত্র ঃ ভূমিকার শেষ প্যারার মধ্যাংশ)।

(খ) যদি কেউ আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে আজো যারা বেঁছে আছে তাদের বুঝায়। তাহলে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদেরকে আদিম বলে বর্ণনা করলে সত্যের অপলাপ হবে। তারা সভ্য জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। বস্তুতঃ এরা অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং এদের পারিবারিক গঠন পদ্ধতিও কিছুটা হিন্দুদের মত। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এরা অনেক দিন থেকেই সভ্য সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত। (সূত্র ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ প্রথম প্যারা)।

উপরোক্ত বক্তব্যের মাঝেই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী অবাঙ্গালীদের আদিবাসী ও উপজাতিভুক্ত হওয়া, তথা তাদের স্থানীয় প্রাগৈহাসিক আদিম চরিত্র থাকা পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। সভ্যতার অনুসরণ ও আদিম ভাবধারা পরিত্যাগ শেষে তাত্বিক অর্থে কারো পক্ষেই আদিবাসী আর উপজাতি থাকার দাবী করা ভুল। এ বক্তব্য অন্যান্য অবাঙ্গালীদের বেলায়ও খাটে। অস্থানীয়রা তো আদিবাসী হতেই পারে না।

বস্তুতঃ তাত্বিক অর্থের আদিবাসী ও উপজাতীয় লোকের বাংলাদেশের কোথাও থাকা নিশ্চিত নয়। যারা তা হওয়ার দাবী করছেন, তারা সভ্যতা গুণে গুণান্বিত ভিন্ন লোক। শাখাও সংখ্যালঘু অর্থে উপজাতি ও আদিবাসী আখ্যা গ্রহণকেও অবিতর্কিত ভাবা যায় না। এই অর্থে বর্ণিত সংজ্ঞা গুলোর ব্যবহার সর্বজন মান্য নয়। তাত্বিক অর্থের আদিবাসী ও উপজাতি সংজ্ঞাই সর্বত্র প্রচলিত। জাতিসংঘ কর্তৃক বিবৃত আদিবাসী সংজ্ঞার সাথেই স্থানীয় আদিবাসী দাবীদারগণ একাত্ম। অথচ তাত্বিক অর্থে তারা তা নন তারা অস্থানীয়। শাব্দিক অর্থে তারা স্বদেশীসংখ্যাগুরু বাঙ্গালীদের বিপরীতে গঠন, ভাষা ও চারিত্রিক ভিন্নতা গুণে স্থানীয়ভাবে শাখা বোধক উপজাতি আখ্যায়িত হতে পারেন। এটা আদিবাসী সমার্থক সংজ্ঞা নয়।

অবাঙ্গালী স্থানীয় সংখ্যা লঘুদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও বলা যায় যে, তাদের পক্ষে তাত্বিক অর্থে আদিবাসী ও উপজাতি পরিচিতি যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া আবশ্যক। নতুবা এটা হয়ে থাকবে বির্তকিত।

এটা ও অনস্বীকার্য যে, এই গরীব দেশে দুঃখ দুর্দশা অভাব অসুবিধা ব্যাপক ও সার্বজনীন। বলা হয়ে থাকে ভূমিহীন লোকের সংখ্যা শতকরা ষাটেরও অধিক। নিরক্ষরদের সংখ্যা স্বাক্ষরদেরও বেশী। দারিদ্র্য সীমার নীচে পতিত মানবেতর মান সম্পন্ন ফকির মিসকিনদের সংখ্যা শতকরা আশির উপরে। অবাঙ্গালী সংখ্যা লঘুরাও বৃহৎ সংখ্যায় দরিদ্র, এবং তাদের সামগ্রিক সংখ্যা বাঙ্গালীদের তুলনায় শতাংশের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যা লঘুদের অভাব অসুবিধা, দুঃখ দুর্দশা পৃথক বা কারো আরোপিত কিছু নয়। এটা জাতীয় দুরবস্থার অংশ। যদি প্রধান জনগোষ্ঠী

বাঙ্গালীরা একাই সুখী সমৃদ্ধ হতো এবং এক তরফা শুধু সংখ্যা লঘুরা অবহেলিত আর বঞ্চিত হতেন, তাহলে তা তাদের প্রতি অবিচার জ্ঞান করা যেতো। এটা জানা কথা যে, বাংলাদেশে দুধ মধুর নহর বইছে না, আর একা বাঙ্গালীরা ও তা লুট করে খাচ্ছে না। চাকচিক্যময় কিছু শহর নগর আর ভাগ্যবানরা গোটা দেশ ও জাতির চিত্র নয়। ভূখা নাঙ্গা শ্রীহীন সাধারণ বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন, যা সেবা ও পরিচর্য্যার অপেক্ষায় ধুঁকছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের কেবল নিজের দুঃখ আর বঞ্চনাকে বড় করে দেখা, সংকীর্ণতা আর এক পক্ষ দর্শিতারই শামিল। এই দৃষ্টিতে বঞ্চিত আদিবাসী ও দরিদ্র উপজাতি মানসিকতা একটি মেনিয়া। অনুরূপ খন্ড চরিত্র সম্পন্ন আরো অনেক মেনিয়া আমাদের অগ্র যাত্রাকে ব্যাহত করছে। প্রসারিত জাতীয় চেতনার মাধ্যমে এই রোগগ্রস্থতাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। নতুবা এই মানসিক রোগ, গোটা দেশ ও জাতিকে পঙ্গু করে দিবে। আদিবাসী ও উপজাতি কারা? অন্যান্যদের তুলনায় তাদের সংখ্যা কতো? সম্পদ সম্পত্তি, আয় রোজগার শিক্ষা কর্মসংস্থান ইত্যাদির তুলনামূলক হিসেবে তারা কি বঞ্চিত? এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে গেলে, হতাশ হতে হবে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান তো এ তথ্যই দান করে যে, তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশে সর্বাধিক অগ্রসর ও সুবিধাপ্রাপ্ত লোক। তাদের কারো কারো আকাঙ্খা হলো নিজেদের অধ্যুষিত অঞ্চলে একাধিপত্য লাভ। এই লক্ষ্য অর্জনে যুক্তি হিসেবে বাঙ্গালী অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হয়। কিন্তু তাদের নিজেদের দ্বারা যে বাঙ্গালীরা নিগৃহীত তা অবলীলায় চেপে যাওয়া হয়। এটাও এ যাবৎ চাপা ছিলো যে, কথিত উপজাতীয় অঞ্চলে বাস্তবে তাদের প্রাধান্য কৃত্রিম ও বৃটিশ কর্তৃক আরোপিত। তাদের অধিকাংশ হলো বহিরাগত। তদুপরি অভিবাসনের পক্ষে তাদের দ্বারা কোন আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হয়নি। এটা প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, তারা অভিবাসন সুযোগ প্রাপ্ত প্রাচীন শরণার্থী বংশধর। আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্ব তাদের দ্বারা এখনো অর্জিত হয়নি। ১/১৯০০ রেগুলেশনের অধীন রচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারা তাদেরকে অভিবাসনের সুযোগ দান করেছে। এই সুত্রে তারা আশ্রয় প্রাপ্ত বাসিন্দা। তবে শরণার্থী অভিবাসীর তকমা এখনো তাদের পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত আছে। যদি বাংলাদেশের বসবাস অর্থে বাঙ্গালীরা দাবী করে তারাই বাংলাদেশের চিরকালীন প্রধান বাসিন্দা, তবে তাই সঠিক হবে। পক্ষান্তরে তথাকথিত আদিবাসীদের সংখ্যা জাতীয় জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তারা বগিরাগত জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নয়। তখন উক্ত দাবীটি কি যুক্তি ও তথ্যে খন্ডানো যাবে? প্রধান জনগোষ্ঠীকে বৈরী ও প্রতিপক্ষে পরিণত করে অনুবিক্ষনীয় সংখ্যালঘুদের নিজেদের রাজা উজির বানানোর বিদেশী মদদপুষ্ট আত্মম্ভরী এই প্রচেষ্টা সত্যিই দুঃখজনক।

সংখ্যালঘুরা এদেশের বৈচিত্র্যময় মানব সম্পদ। বাঙ্গালীরা তাদের সম্মান ও প্রীতিপূর্ণ আন্তরিকতায় স্বদেশী জ্ঞান করে। তাদের সাথে বাঙ্গালীদের কোন রূপ জাতীয় বৈরিতা বা ঘৃণা নেই। এমতাবস্থায় সংখ্যালঘুদের খামোখা ভয় ও হীমন্যতায় ভোগা উচিত নয়। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা ও অস্তিত্ব কোন মতেই অবহেলিত নয়। এটা এ দেশের কারো কাম্য ও নয়। অনুরূপ সন্দেহ অবিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। তবে পৃথিবীটাই

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। জীবনটাও সংগ্রামশীল। এই প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামকে ভয় পেলে চলে না। হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জয়ের সূচনা হয়। তলিয়ে যাওয়ার মাঝে সহযোগীর সহায়তার সংযোগ ঘটে। তাই সহযোগী সহযাত্রীদের প্রাচুর্য্যে ও প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হতে নেই। বরং একেই নিজের অবলম্বন করে উন্নতির প্রয়াস চালাতে হবে। সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র জন্ম থেকে মৃত্যু আর ঘর থেকে বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত। এটা সাফল্য ও বেঁচে থাকার অবলম্বন। এটা আপন পর সবার সাথে স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র আচরণ বিধি। ঘন বসতির এই গরীব দেশে কাউকে বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা দান, বা কারো জন্য কিছু সংরক্ষিত রাখার উপায় বা সংগতি কোনটাই নেই। পর্যাপ্ত সম্পদ সম্পত্তি ও উপায় উপকরণ না থাকাটাই মূল কারণ। মিলিত ভোগ দুর্ভোগে আমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে। ক্ষুদ্র ও খন্ডিত স্বার্থ, আর গোষ্ঠী চিন্তা, এ ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। পক্ষ বিপক্ষ নির্বিশেষে স্বদেশী জনতার সংস্থান সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই। মানুষের সংখ্যাস্ফীতি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ধরে রাখা সম্ভব নয়। যদি মহাকাশের বিপর্যস্ত ওজন স্তর সত্যই প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখে, আর পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্র তলে তলিয়ে গিয়ে কোটি কোটি লোককে ছিন্নমূল করে দিবে। সে সম্ভাব্য বিপর্যয়ে আমাদের সবাই উঁচু অঞ্চলসমূহে একত্রে নতুন করে ভাগে যোগে বসবাস করতে হবে। সুতরাং সুবিধাবাদ ও সংরক্ষণবাদ অনুকরণীয় নয়।

বিপক্ষ সংখ্যা লঘুদের নির্মূল করা বাংলাদেশের জাতীয় নীতি নয়। সংখ্যা লঘুদের প্রতি অত্যাচার এ দেশের সচেতন বিবেকবান লোক, চিরকাল ঘৃণা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা বরদাস্ত করা হবে না। এটাই তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এ বিষয়ে বিদেশের মদদ গ্রহণ দেশের আভ্যন্তরীন বিসয়ে হস্তক্ষেপের শামিল। এটা পারস্পরিক সন্দেহ আর ভুল বুঝাবুঝির সহায়ক, সুতরাং অবাঞ্ছিত। উপজাতি আর আদিবাসী পরিচিতি নিয়ে আন্দোলন, বিভেদবাদী চিন্তারই ফসল। সন্দেহ করা হয়, এটাও বিদেশী মদদপুষ্ট কুমন্ত্রণার ফল। সংখ্যালঘুদের উচিত, তাদের স্বার্থ ও বাঁচার প্রতিটি আন্দোলনে স্বজাতি ও স্বদেশী বন্ধুদের উপর নির্ভর করা। স্বদেশে তারা মোটেও অসহায় নয়। বিদেশী বংশোদ্ভুতএ পর্যন্ত তাদের বহিষ্কার ও বিতাড়নের কোন দাবী ওঠেনি, এবং তা সমর্থনও পাবে না। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সংরক্ষিত। এতে সন্দেহ আর হীনমন্যতার কোন অবকাশ নেই।

উগ্র অসহিষ্ণু বিদেশী মনা অবাধ্য স্বাতন্ত্র্যবাদীদের উদ্দেশ্যে কিছু সত্য তথ্য উপস্থাপন করাও জরুরি। কারণ তাদের প্রচারিত বিভ্রান্তি থেকে অন্যদের মুক্ত রাখার এটাই উপায়। সত্য তথ্য অপ্রিয় হলেও এক্ষেত্রে তার প্রচার অপরিহার্য। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ঘাঁটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম ও গারো অধ্যুষিত কিছু অঞ্চল। এরা অকারণে অসন্তুষ্ট বিভ্রান্তপক্ষ। তাদের বিপক্ষে যৌক্তিক ও প্রতিরক্ষামূলক চিন্তা-চেতনা থাকা আবশ্যক।

গারোদের মূল জাতীয় অঞ্চল ভারতভুক্ত গারো পাহাড় এলাকা। তারা এতদাঞ্চলে ঐ তাদেরই সম্প্রসারিত অংশ। বাংলাদেশের আদি বসবাস বা প্রাচীন জীবন মানের সূত্রে

এরা এখানকার আদিবাসী নয়। ইতিপূর্বে তারা নিজেদের উপজাতি জ্ঞান করতো। আজ উক্ত নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞাটিও তাদের পক্ষে অনুপযোগী। অধুনা তারা সভ্য লোক ও নেহাত সংখ্যালঘু একটি অবাঙ্গালী সম্প্রদায়। রং ও গঠনে তারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। বাঙ্গালীদের বিপরীতে এটা তাদের মাঝে প্রধান লক্ষ্যণীয় পার্থক্য। তাদের সাথে বাঙ্গালীরা দীর্ঘদিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত। উভয়ের মাঝে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক বৈরিতা নেই। তবে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং কিছু যৌন সম্পর্ক ভিত্তিক ঘটনাবলী প্রায়ই ঘটে থাকে, যাকে সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় নিপীড়ণমূলক পরিকল্পিত বৃহৎ কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কোন সমাজ ও সম্প্রদায়ই এ রূপ অপ্রীতিকর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী থেকে মুক্ত নয়। এটা জাতীয় অসন্তোষ ও বৈরিতার উদাহরণ রূপে চিহ্নিত হতে পারে না। তবে সুখের কথা যে, গারোরা এ পর্যন্ত কোন রূপ গুরুতর অসহিষ্ণুতায় মেতে উঠেননি। ষড়যন্ত্রমূলক উস্কানীতেও তারা ধৈর্য্য ধারণ করে আছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অশান্ত অঞ্চল। এখানে উচ্চাভিলাষী রাজনীতি, একদল লোককে বিদ্রোহী করে তুলেছে, এবং কিছু লোককে সুবিধা ভোগীতে পরিণত করেছে। বৃটিশ আমলে আরাকানী উদ্বাস্তুদের দ্বারা চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী পর্বতাঞ্চল ঘন অধ্যুষিত হয়ে পড়ে। তারা স্বদেশে ফেরত যায়নি, এবং পরিশেষে এখানেই অভিবাসন গ্রহণ করে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী অধ্যুষিত হওয়ার ইতিহাস। তবে স্বল্প সংখ্যক কুকি, ত্রিপুরা মগ ও বাঙ্গালীরাই ছিলো-এর প্রাচীন বাসিন্দা। ত্রিপুরা ও মগ বাসিন্দারা ত্রিপুরা রাজ্য ও আরাকানের দখল অভিযানের সাথী হয়ে এতদাঞ্চলে এসেছিল। পরে বৃটিশ আমলে বহিরাগমনের মাধ্যমে তাদের স্বজাতীয়দের আরো সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। চাকমাদের স্বল্প সংখ্যক লোক জনৈক দলপতি শেরমস্ত খাঁর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ১৭৩৭ সালে চট্টগ্রামের দক্ষিণ বাঙ্গুনীয়ায় এসে অভিবাসন গ্রহণ করেন। পরে বৃটিশ আমলে তাদের বৃহদাংশ উত্তর আরাকান থেকে পালিয়ে আসেন। তাদের কেউ এতদাঞ্চরের আদি বাসিন্দা নন। এতদাঞ্চল এই বহিরাগত লোকজনের কারো মূল জাতীয় আবাস ভূমিও নয়। আচরণেও তারা সুসভ্য। সুতরাং তাত্ত্বিক অর্থে এদের উপজাাতি আর আদিবাসী হওয়া সঠিক নয়। তাদের আচরিত জুম চাষ পেশাই আদিমতার একমাত্র নিদর্শণ। এটাও আজকাল প্রায় পরিত্যক্ত।

ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিপরীতে কথা বলে লাভ নেই। তদ্বারা কেউ রাজা-উজির হতে পারবেন না। দেশও বাঙ্গালী দখল থেকে মুক্ত হবে না। এ দেশের বাঙ্গালী প্রাধান্য বিধিদত্ত। এর সাথে আপোস করে সুখ তালাস করাটাই, সংখ্যালঘুদের পক্ষে বাস্তব কাজ। এর বিরোধিতা করা বা পৃথক একাধিপত্যের দুরাশায় মেতে ওঠা, মানে স্রোতকে উজানে ঠেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া। তাতে ক্ষয়ক্ষতি হলেও, লাভের সম্ভাবনা নেই। আজকাল অস্ত্রবল নয়, জনবলই সাফল্যের হাতিয়ার। তাতে সংখ্যালঘুরা নয়, তাদের প্রতিপক্ষই বলিয়ান। বিদেশী মদদের দ্বারা-এর ক্ষতিপূরণ হওয়া অসম্ভব। ইতিহাস আর তত্ব-বিজ্ঞানও প্রধান পক্ষের সমর্থক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন-বিধি ১৯০০ এর ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যার রহস্য এখন উদঘাটিত হয়ে গেছে। আগে এটা বৃটিশের উপনিবেশ ছিলো। কিন্তু এখন এটা বাংলাদেশের দখলীয় উপনিবেশ নয়, অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিন্ন আইন ও প্রশাসনের আওতায় এটা পরিচালিত হবে। সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতির ব্যত্যয় এখানে হতে পারে না।

১৯০০ সালের শাসন বিধি স্থানীয় অবাঙ্গালীদের ভূমিদাস করেছে, ভূমি মালিক নয়। ঐ আইন বলে তাদের কিছু লোক সর্দার আর মাতবর হলেও, তারা সরকারী রাজস্ব এজেন্ট, দাসানুদাস ও খয়েরখা। জেলা প্রশাসক তাদের পরামর্শ শুনতে বাধ্য নন। বরং তারাই জেলা পশাকের হুকুম তামিল করতে বাধ্য। সাধারণ লোকজন এদের সেবাদাস। তাদের বাধ্যতামূলক শ্রম দান অস্বীকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্দোবস্তি আর ইজারা ছাড়া, তাদের পক্ষে বসবাস, কৃষিকাজ, পশু পালন, ও পশু চারণ নিষ্কর নয়। তাদের স্থানান্তর গ্রহণ অনুমোদনীয় নয়, বরং দ্বৈত কেপিটেশন টেক্স বা দ্বিগুণ মাথাপিছু কর আরোপ যোগ্য, এবং প্রতিটি লোক জুমিয়া গণ্য। জুমিয়াদের সর্দার ও মাতবরগণই গালভরা রাজা ও হেডম্যান নামে খ্যাত। আসলে এই আইনটি সম্পূর্ণভাবে জুমিয়া ও জুমভূমি শাসন বিধি, সাধারণ আইন নয়।

উল্লেখিত এই শাসন বিধির ৫১ ও ৫২ ধারায় কিছু তাত্বিক সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোর ভিতর দেশী, উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী সংজ্ঞাগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে। এই সংজ্ঞাগুলোর বদৌলতেই স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী নিজেদের এ দেশীয় স্থানীয় উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী ভাবেন। কিন্তু আসলে এই ধারণা নির্ভুল নয়। আইন দুটি এখানে প্রণিধান যোগ্য যথা ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ধারা ৫১। Expulsion of undesirables. If the Deputy commissioner is satisfied that the presence in the district of any person who not a native of the district is or may be injurious to the peace of good administration of the district. he may for reasons to be recorded in writing. order such person, if he is within the district, to leave the district within a given time, or if he is out side the district forbid him to enter it.

বাংলা ঃ ধারা ৫১ অবাঞ্ছিত লোকদের বিতাড়ণ।

যদি জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হোন যে, এ জেলার স্থানীয় বাসিন্দা নয়, এমন ব্যক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান, যা এ জেলার সুষ্ঠু শান্তি-শৃংখলার পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা যুক্ত, তা হলে তিনি লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক ঐ ব্যক্তিকে যদি সে জেলার ভিতরে থাকে, তবে প্রদত্ত সময়সীমার ভিতর, এ জেলা ত্যাগ করতে, অথবা বাহিরে থাকলে, প্রবেশ নিষেধ করে, আদেশ জারি করতে পারবেন।

ধারা ৫২ ঃ Immigration in to the Hill tracts. Save as here in after provided no person other Than a chakma, mogh, or a member of any hill tribe, indigenous to the Chittagong. Hill tracts, The Lushai Hills the Aracan Hill Tracts or the State of Tripura shall enter or reside within the Chittagong Hill Tracts unless he is in possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion.

বাংলা ঃ পর্বতাঞ্চলে অভিবাসন। নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি থাকা ব্যতিরেকে চাকমা মগ অথবা কোন পাহাড়ী উপজাতীয় সদস্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড় আরাকান পর্বতাঞ্চল, অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী, এমন লোক ব্যতীত অপর কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবে না, যদি না তার কাছে জেলা প্রশাসকের বিচেনা বলে মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতিপত্র থাকে।

৫১ ধারা মতে এ জেলার নেটিভ বা দেশী অথবা স্থানীয় নয়, এমন ব্যক্তি আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গার অপরাধে এ জেলায় নিষিদ্ধ ও বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য। ৫২ ধারা মতে চাকমা ও মগ সম্প্রদায় সহ ঐ সব পাহাড়ী উপজাতিভুক্ত লোক এতদাঞ্চলে অভিবাসন পাওয়ার যোগ্য, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম লুসাই পাহাড় আরাকান পর্বতাঞ্চল ও ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী। অথচ বর্ণিত লোকেরা স্থানীয় আদিবাসিন্দা নয়। এটা অন্যায় সুযোগ দান।

৫১ ধারায় ব্যক্ত এ জেলার নেটিভ বা দেশী অর্থ হলো স্থানীয় স্থায়ী আদি বাসিন্দা, অভিবাসী বা বিদেশাগত লোক নয়। ৫২ ধারায় তিন শ্রেণীর লোককে অভিবাসনের সুযোগ দেয়া হয়েছে, যথা (১) চাকমা (২) মগ ও (৩) আদিবাসী। তৃতীয় ভাগে বর্ণিত আদিবাসীরা কোন সাম্প্রদায়িক নামে চিহ্নিত নয়। এখানে সাম্প্রদায়িক নামে চিহ্নিত চাকমা ও মগদের পাহাড়ী উপজাতি ও আদিবাসী বিশেষণ ভুক্ত করা হয়নি। বর্ণিত বাক্যে ওর বা অথবা শব্দ যোগের দ্বারা এই পরিচয় গত বিভক্তি টানা হয়েছে। সুতরাং হিল ট্রাকট্স ম্যানুয়েল বা পার্বত্য শাসনবিধি মতেও চাকমা ও মারমা নামীয় জনগোষ্ঠী পাহাড়ী উপজাতি ও আদিবাসী স্বীকৃত নয়। এই দাবী, আইনটির ভুল ব্যাখ্যা প্রসূত। তত্ত্ব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঐ সব লোকই উপজাতি ও আদিবাসী, যারা নিজ জাতীয় আবাস ভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, আচার অভ্যাস নিয়ে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, যারাসভ্য ভাবধারা থেকে মুক্ত, আর আদিম ধারণাভুক্ত টাবু মানে ও টুটেমে বিশ্বাস করে এবং বসবাস সূত্রেও স্থানীয়। বলা যায় হাল আমলের পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী কোন সংখ্যা লঘুই এই শ্রেণীতে পড়ে না। নিঃসন্দেহে তারা সভ্য সমাজের লোক, কোনক্রমেই পাহাড়ী উপজাতীয় লোক নয়। ত্রিপুরা ও গারোদেরও উক্ত শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এরা শাব্দিক অর্থে শাখা জাতি তথা সংখ্যালঘু স্বীকার্য্য। আদি বসবাসের সুত্রে ও কখনো স্থানীয় আদিবাসী নয়। এই অভিবাসন আইনটির নিষেধাজ্ঞা স্বদেশী বাঙ্গালীদের প্রতিও প্রযোজ্য নয়। এরা বাংলাদেশী সূত্রে স্থানীয় আদিবাসিন্দা। বর্ণিত আইনে বাঙ্গালীদের কোন উল্লেখ ও নেই।

পরিশেষে আরেকটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে যে, বাংলাদেশে কি আদৌ কোন উপজাতিও আদিবাসী নেই? এর উত্তর হলো কিছু সাওতাল, বেদে, উত্তর বঙ্গীয় কিছু ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু, এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিলীয়মান জুমজীবী কুকি ও অন্যান্য বন্য পরিবেশবাসী কিছু ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আদিবাসী পদবাচ্য । তবে নিসন্দেহে চাকমা, মগ ও ত্রিপুরারা এই দলভুক্ত লোক নয়। তারা মূলত অস্থানীয়। কোন স্থানীয় লোকের উপরই স্বদেশে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন প্রযোজ্য নয়।

চাকমাদের শতাব্দী প্রাচীন জনসংখ্যা ঃ

কমিশনার বাহাদুরের চিঠি নং ৫৬৫ তাং ৩-৬-১৮৮১ মূলে তখনকার চাকমা জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিলো ঃ

রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের সার্কেলভুক্ত করদাতা

চাকমা জুমিয়া	৫০১১ পরিবার
মাং সার্কেলভুক্ত চাকমা	১০৫৮ পরিবার
নিষ্কর ১৫% হিং	৯১০ পরিবার
স্বাধীন বন্দোবস্তি প্রাপ্ত চাকমা	১২৬৫ পরিবার

মোট ঃ ৮২৪৪ পরিবার

পরিবার প্রতি ৫ জন হিসাবে মোট ৪১২২০ জন চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা সহ এই হিসাব সামগ্রিক।

উপজাতীয় তত্ত্বকথা।

বিষয়টির ধারণাগত বিশ্লেষণ আগে দেওয়া দরকার। উপজাতীয় লোকজন বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সোচ্চার। দেশে বিদেশে বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক বিদ্যমান। উপজাতীয় পক্ষের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের নিজস্ব এলাকা। বাঙ্গালীরা এখানে বগিরাগত। তাই বাঙ্গালীদের আগমন, বসবাস ও আবাসন গ্রহণ আপত্তিকর। সম্প্রতি মানবতাবাদী একটি ইউরোপীয় গোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও ত্রিপুরায় তাদের তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 'লাইফ ইজ নট আওয়ার্সন্ব নামে একটি প্রতিবেদনমূলক পুস্তক ছেপে, উপজাতীয় দাবীর পক্ষাবলম্বন করে, আন্তর্জাতিক ভাবে ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। দেশেও সাধারণ থেকে গুণী জ্ঞানী পর্যন্ত প্রচুর লোক বিষয়টি নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তিতে আছেন। সবই ভুল তথ্য আর তথ্যহীনতায় আচ্ছন্ন। প্রকৃত তথ্য দুষ্প্রাপ্য নয়। তবু খুঁজে দেখার প্রয়াস নেই। সস্তা বুলিতে সবাই বিভ্রান্ত। বিতর্কটি অনভিপ্রেত। সহজভাবে এই জটিলতা কাটিয়ে ওঠার উপায়ও নেই। বিষয়টি ধারণাজাত, তাই এর প্রকৃত সমাধান অন্য কিছুতেও নেই। অস্ত্র, জোর জবরদস্তি, কঠোরতার প্রয়োগ, এখানে যথার্থ নয়। মানুষের মন মস্তিস্ক ও ধারণাকে তজ্জন্য সহায়ক তথ্য যোগাতে হবে। এই ক্ষেত্রে তথ্য হীনতা ও ভুল তথ্যই মারাত্মক। উপজাতীয় পক্ষের হাতে এতদাঞ্চলে তাদের আদি বাস সম্বন্ধে শ্রুতিকথা ও কিংবদন্তি ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তাদের কিংবন্তিমূলক কাহিনী ও দাবীকে, অবিশ্বাস্য বলে প্রত্যাখ্যান করা হলে, তাকে অসঙ্গত বলাও যাবে না। বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ কম হলেও খাঁটি ও নির্ভরযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলা হয়, উপজাতীয় দাবীগুলো ভুল ধারণাজাত ও হিংসা প্রসূত, এবং তাতে গ্রহণীয় যুক্তি নেই, তাহলে তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়াও যাবে না। মনে হয় উপজাতীয় মহল যুক্তির চেয়ে হিংসার দ্বারাই অধিক প্রভাবিত। তাদের মাঝে উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিতদের অভাব নেই। খুঁজে দেখলে পাওয়া সম্ভব যে, এতদাঞ্চলের মাটি ও মানুষ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ও তথ্যবহুল পুস্তকাদি লিখিত হয়েছে। সে সব লেখকগণের অনেকে আন্তর্জাতিকভাবে নির্ভরযোগ্য পন্ডিত বলেও স্বীকৃত, এবং ঐ পুস্তকগুলো ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাত। ঐ লেখকও পুস্তিকাগুলোর অবদানের অনেকাংশ এই পর্বত্যাঞ্চল নিয়েই রচিত। সেই বিদেশী পন্ডিতদের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান, প্রত্ন নির্দশন, ও প্রাপ্ত পূরাকীর্তি সমূহের মাধ্যমে যে বাস্তব অতীত-চিত্র ফুটে উঠে, তা একাধারে নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ। সে সব বর্ণনাকে অবলম্বন করে উপজাতীয় দাবীগুলো রচিত হলে, আপত্তির কিছুই থাকতো না। কিন্তু দুঃখ হয় আজগৌবী কথা কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়ায়। তাই বলতে ইচ্ছে হয় উপজাতীয় মহলের ইতিহাস মূলক বক্তব্যের মূল অত্যন্ত কাঁচা। তাদের এ দেশীয় আদি অধিবাস নিশ্চিত নয়। সব দাবীদাওয়ার আগে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা এদেশের আদি বাসিন্দা ও বিশুদ্ধ স্থানীয় ভূমিজ সন্তান। দক্ষিণ পূর্ব এশীয় ভাষা সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য ধারণ করে, অধিকাংশ উপজাতি এখনও বিদেশী পরিচয় ধারণ করে আছেন। শত বছরের জন্ম মৃত্যু আর বসবাসেও তারা অবাংলাভাষী। তাতেই প্রমাণিত

হয় তাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী দেশে নয় বিদেশে অবস্থিত। মন মানসিকতা ধ্যানে ও জ্ঞানে এখনও তাদের মাঝে বিজাতীয় যোগসূত্র অক্ষুণ্ন আছে। কথায় কাজে মননেও জন্মসূত্রে তাদের ভিন্নতা, ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় পরিচিতি, অম্লান ও পরিষ্কার। তাদের এদেশীয় পরিচয় আর আনুগত্য প্রশ্নাতীত হলে, তারা আমাদের স্বদেশবাসী, এটা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য্য হতো। যাদের ব্যাপারে আমরা অধিক আগ্রহান্বিত, সেই চাকমা সম্প্রদায়কে নিয়েই গোল বেঁধেছে অধিক।

আমাদের ধারণা ছিলো, যেহেতু চাকমারা ইতিহাস ঐতিহ্যে আত্মীয়তায় আচার আভ্যাসেও ধর্মে-কর্মে অধিকতর ভাবে ভারত উপমহাদেশীয় চরিত্র সম্পন্ন, সুতরাং তারা চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রেও অধিকহারে, এ দেশীয় ভূমিজ সন্তানদের সাথে একাত্ম হবে। আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলা, আর বাঙ্গালীদের পোষাকী চরিত্রে আগাগোড়া সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের বাঙ্গালী হওয়ার প্রতি অস্বীকৃতি, একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। এই ধারণাগত পার্থক্য বাঙ্গালীতেও চাকমাতে মৌলিক তফাৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। বাঙ্গালীরা তাদেরকে একাত্ম ভাবলেও, তাতে তারা অস্বীকৃত। অধিকন্তু তারা অন্যান্য উপজাতিদের থেকেও পৃথক এক সম্প্রদায়। মানসিক কারণে তারা যেমন বাঙ্গালী হতে অস্বীকৃত, তেমনি ভাষাগত কারণে প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতি সমাজ থেকেও ভিন্ন। দেশ ও জাতির প্রতি এ কারণেই তাদের একাত্মতা ও আনুগত্য সন্দেহাতীত ভাবা হয় না। তাদের আচরণে, বাঙ্গালী আর উপজাতি সহ অবশিষ্ট দেশবাসী সন্দিহান। এ সন্দেহকে বাড়িয়ে তুলেছে, তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র প্রচেষ্টা। এ পরিস্থিতিতে অতীত ইতিহাস তুলে ধরা এ জন্য দরকার যে, তাতে তাদের হুশ ফিরে আসতে সহায়তা হবে। এ কথা জানিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক যে, চাকমারা মূলতঃ আরাকান থেকে আগত বিদেশী। তাদের জাতীয়তার চেতনা ও মানসিকতা এখনও তাই ভিন্ন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ধরে রাখলেও, এদেশে তাদের বসবাস এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নয়। এদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অণুমোদন লাভের পরেই এই বিদেশী শরণার্থীদের বংশধরেরা এ দেশে আইন সঙ্গত নাগরিকে পরিণত হবে। এখন তাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয় হলো মূলতঃ এদেশীয় নাগরিকত্ব ও জাতিত্বে উত্তরণ, স্বায়ত্ত শাসন বা বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জ করা নয়। প্রমাণ ভিত্তিক ইতিহাসের বিবরণে, একমাত্র কিছু ত্রিপুরা, মুন্ড শিকারী কুকি, আর মগ সমাজভুক্ত কিছু লোকই প্রাচীন কাল থেকে চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে আগমন ও বসবাসের ঘটনার সাথে জড়িত। আর কোন উপজাতীয় লোকের এতদাঞ্চলের প্রচীন অধিবাসী হওয়া সমর্থিত নয়। অন্যান্য উপজাতীয়দের এতদাঞ্চলে আগমন নির্গমন ও বসবাস সর্বাধিক বৃটিশ আমলেরই ঘটনা।

তবে বগিরাগত উপজাতীদের মাঝে চামমাদের কিছু লোকের আগমনকাল মোগল আমলের শেষ সময় বলেই নির্ণীত হয়। ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম ও পূর্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে, বিভিন্ন সময়ে কুকি ও ত্রিপুরাদের রাজনেতিক আগমন নির্গমন ঘটেছে ও বসবাস সম্প্রসারিত হয়েছে। তবু তাদের খুব কম লোকই

এতদাঞ্চলে স্থায়ী পুনর্বাসন গ্রহণ করেছে। এখানে কৃষি কাজে ভূমি ব্যবহারকারী স্থায়ী ও প্রধান অধিবাসী হওয়ার গৌরব একমাত্র বাঙ্গালীদেরই প্রাপ্য। যদিও তখন লোক বসতি ছিলো বিরল, এবং অধিকাংশ পাহাড়াঞ্চল ছিলো অনাবাদী। কুকি মগ ও ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য উপজাতিদের নাম পরিচয় আর অস্তিত্বের কথা সর্বাধিক বৃটিশ আমলেই গোচরীভূত হয়। ঐ আমলের শুরুতে দূরবর্তী মুক্তাঞ্চলবাসী বিভিন্ন উপ-জাতীয় লোকের এতদাঞ্চলে আগমন আক্রমণ ও তজ্জন্য অরাজকতা ঘটে। বার্মা ও আরাকানের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণেও বটে, বহিরাগমন ব্যাপক ও তরান্বিত হয়। এসব ঘটনার বিবরণ সেকালের সরকারী রেকর্ডপত্রে বিষদভাবে লিপিবদ্ধ আছে, এবং তা নিয়ে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক বই পুস্তক ও রচিত হয়েছে। পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও ডে বারোজের ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অংকিত প্রাচীন বাংলার একটি মানচিত্রই সর্বাধিক প্রাচীন দলিল, যা চাকমাদের বহির্দেশীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম তথ্য দান করে। অন্যান্য প্রাচীন তথ্যগুলো উপজাতীয় কিংবদন্তি থেকে গ্রহীত, এবং তা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য নয়। তৎপর আমরা অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের গবেষণা নিবন্ধ 'অরিজিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টসব থেকে অবগত হইঃ জনৈক শের মস্ত-খাঁ-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তদীয় অনুসারী কিছু চাকমা সহ আরাকান ত্যাগ করে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে মোগলদের অধীন চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্বাসন গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে ১৭১১ খ্রীঃ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সীমান্ত অঞ্চলে, উপজাতীয় রাজা হিসাবে, জনৈক চন্দন খাঁ আবির্ভুত হোন, যার বংশধরদের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ ১৭২৪ খ্রীঃ সালে অবাধ্যতার কারণে, মোগল শক্তি কর্তৃক আরাকানে বিতাড়িত হোন। চন্দন খাঁর বংশ ও তাদের উপজাতীয় অনুসারীদের পরিচয় পরিষ্কার নয়। তাদের সাথে চাকমা ও শেরমস্ত খাঁ বংশের সম্পর্ক থাকা অনিশ্চিত। উভয়ের আগমন ও নির্গমনকালের মাঝ খানে, তের বছরের এক ব্যবধান বিদ্যমান। মার্মা বা মগেরা নামেই বর্মী পরিচিত। ত্রিপুরা ও লুসাই জনগোষ্ঠী, ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরাম থেকে আগত। চাকমাদের রাজা শের জব্বার খানের সীলমোহরই প্রমাণ, তারা সম্প্রদায়গতভাবে বৃটিশ আমলের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। চাকমা রাণী কালিন্দির একটি লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, তাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শেরমস্ত খাঁ। একটি চাকমা ছড়া গানেও তাদের আদিবাস বিবৃত হয়েছে, যথাঃ-

'আদি রাজা শেরমস্ত খাঁ

রোয়াং ছিল বাড়ী

তার পর শুকদেব রায়

বান্ধেজমিদারী।'

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, উপজাতীয়দের আদি বসবাস ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। তারা এতদাঞ্চলে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর। তাদের নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা,

এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশী হওয়া মঞ্জুর সাপেক্ষ। তারা বাঙ্গালী নয়, বাংলাদেশী ও নয়, মূলতঃ অস্থানীয় আর বিদেশী বংশোদ্ভুত।

আরাকানবাসী মগ ও চাকমাদের বিপুল সংখ্যায় স্বদেশ ত্যাগ ও চট্টগ্রাম সীমান্তের পাহাড়ী অঞ্চলে অশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় ও প্রধান ঘটনার কাল হলো প্রাথমিক বৃটিশ আমল, যার বিশদ ও নিরপেক্ষ বিবরণ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের লেখনীতেই পঠনীয়, যিনি এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় একজন প্রধান পন্ডিত যথা ঃ

A greater porion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hills undoubtedly came about two generations ago from Aracan. This is asserted both by their own traditions and by records in the Chittagong Collectorate. It was in some measure due to the erodous of our hill tribes from Arracan that the Burmese war of 1824 took place, which ended in annexation to Britsh territory of the fertile province of Arracan. As this is a point intersting not only from its local bearing on the hill tribes but also in a larger and more important historical sense. I shall trace here the way in which the dissensions between the English authorites. and the Burmese, which eventually culminated in war, hinged in a great measure upon refugees from the hill tribes who fleeing from Arracan into our territory, were pursued and demanded at our hands by the Burmese.

Among the earliest records that we have of our dealings with the Burmese are two letters, written one by the king of Burmah, the other by the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong and rrceived on about the 24th June 1787.

(Ref : The HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND THE DWELLERS THEREIN Page 28/29)

বাংলা ঃ "উপজাতীয়দের যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে বসবাস করছে তাদের অধিকাংশ প্রায় দুস্বপুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐ সব দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত যা চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। আরাকান থেকে উপজাতীয় লোক জনের পলায়ন হলো অন্যতম কারণ যদ্দরুণ ১৮২৪ খ্রীঃ সালের বর্মীযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, যা বৃটিশ ভারতের সাথে উর্বর আরাকান প্রদেশের সংযুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ঘটনাটি শুধু স্থানীয় পাহাড়ী উপ-জাতিগুলোর কারণেই নয়, বরং আরো গুরুতর ও ঐতিহাসিক কার্যকারণেও হৃদয় গ্রাহী। আমি এখানে

সে ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করতে চাই, যদ্দরুণ বৃটিশ ও বর্মী কর্তৃপক্ষের মাঝে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় ও যুদ্ধের পরিণতি লাভ করে, আর তা হলো, পাহাড়ী উপজাতিদের বিপুল সংখ্যায় আরাকান ত্যাগ, ও আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ, যাদেরকে ফেরৎ চেয়ে বর্মী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ ও দাবী উথাপন করেন।

বর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সর্বাধিক প্রাচীন দলিল হলো দু্বটি চিঠি, যার একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক, এবং অপরটি আরাকানের রাজা কর্তৃক, আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিহ হয়, যা সম্ভবতঃ ২৪শে জুন ১৭৮৭ খ্রীঃ তারিখে পাওয়া যায়। (সূত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন পৃঃ ২৮/২৯)

মিঃ লুইন অতঃপর আরাকানের রাজার চিঠি খানার পরিপূর্ণ ইংলিশ ভাষ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরে পুনরায় বলেনঃ

``This letter is explicit enough. The fugitives referred to are evidently men of the Chuckma and Mrung hill tibes, who to this day preserve the recollection of their ancestor's flight from Arracan, The persons in question were probably the chiefs of the clans. and driving of them from British trrritory would have been equivalent to expulsion of the whole clan. (Ref : do page 29)

বাংলা ঃ এই চিঠিখানা যথেষ্ট বিশদ। বর্ণিত পলাতকগণ প্রমাণিতভাবে পাহাড়ী উপজাতীয় চাকমা ও মুরুং সম্প্রদায়ের লোক, যারা এখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের আরাকান ত্যাগের স্মৃকিকথা ধারণ করে আছে। বিতর্কিত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ তাদের সমাজপতি, যাদেরকে বৃটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বিতাড়ণের অর্থ, গোটা সম্প্রদায়কেই বিতাড়ণ (সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)

এবার আরাকানের রাজার প্রদত্ত চিঠিখানা প্রণিধানযোগ্য যথা ঃ

``From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our territories are composed of five hundred and sixty countries and we heve ever been on terms of friendship The inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries belonging to us. A person named keoty habing absconded from our country, took refuge in yours. I did not however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possession refused to sent him to me. I also am possessed of extensibe country and keoty

in consequnce of his disobedient conduct and the strength and influence of my king's good fortune was destroyed.

Dumcan Chukma and Kiecopa lies Marring and other inhabirants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border and exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishman at the mouth of the Naf, and stole away everything he has with him. Hearing of this I' am come to your boundaries with an army in order to sieze them. because they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robber. It is not proper that you should give asylum to them or the other Moghs who have absconded from Arracan and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may be secured. If you do not drive them from your comtry and give them up. I shall be under the necessity of seeking them out with an army, in whatever part of your territories they may be. I send this letter by Mahammed Wassene. Upon recipt of it, either drive the Moghs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer immediately. (Page : 29)

বাংলা ঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের উদ্দেশ্যে ঃ

আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত, এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাতে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের অধীন দেশ সমূহের অধিবাসীগণের সাথে স্বেচ্ছায় আর অবাধে অন্য বিভিন্ন দেশবাসী ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে। কেওটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে সসৈন্যে পশ্চাদ্ধাবন করছি না, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছি, এই আশায় যে, কেওটিকে ধরে অবশ্যই আমার হাতে তুলে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি পরিণামে তার অবাধ্য আচরণ আর আমাদের রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাব গুণে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডোমকান, চাকমা, কায়কোপা, লাইচ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী, পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে এবং

উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা নাফ নদীর মোহনায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে তার যথা সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এটা শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু তারা নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করেছে, আমার রাজার প্রতি আবাধ্য, এবং দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত, সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও যারা আরাকান থেকে পালিয়ে গেছে, আশ্রয় দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচিন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান, ও ধরে হস্তান্তর না করেন, তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানে তারা থাকুক না কেন, একদল সেনা নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠালাম। এটা বুঝে পেয়ে হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, আর তাদেরকে আশ্রয় দিবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র প্রত্যুত্তরে জানাবেন।

(সূত্রঃ ঐ পৃঃ ২৯)

মিঃ লুইন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন, যথাঃ

These letters were received during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the sirder of Arracan, The Chief of Chittagong in the same month of june writes to the Governor General in council reporting this incursion and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance untill this armed force was withdrawn. At the same time he states that in his opinion the refugees should be driven out of British territory. He adds also that these fugitives were persons of some consequence in Arracan, and reports further that a Chakma Sirdar, who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by stating his opinion that this sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up India page 355, records that in 1795 a Burmese army of 5,000 men again pursued some rebellious Chiefs or as they called them robbers right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and two out of the three were put to death with atrocius tortures."

their abode in the hills and jungles for the convenience of plundering. Ten years before this in the year 1777, it appears from a letter dated 31st May, from the Chief of Chittagong to the Honourable Warren Hastings Governor General that some thousands of hillmen had come from Arracan into the Chittagong limits, having been offered encouragement to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and Macfarlane's History of British

In 1809 Macfarlane records that disputes continued to occur in the frontiers of Chittagong and Tipperah, but the organized forays into that territory hardly assumed any definite form until 1823 (Wilson's Narrative of the Burmese war page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824, the primary cause, therefore, of all these disturbance, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtedly the immigration to our hills of tribes hitherto subject to their authority,

The origin of the tribes is doubtfulpoint, pemberton ascribes to them a maloy descendant. Colonel sir A, phayre considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of myamma or Burmese extraction. Among the tribes themselves no record exists, save that of oral tradition, As to their origin, the Khyoungtha alone are possessed of a written language. They have among them several copies of the Raja Wong, or Histrory of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The tongtha on the other hand prosses no written character, and the languages spoken by them are simple to a degree expressing merely the wants and sensations of uncivilized life, The information obtainable as to their origin and past history is therefore naturally meagre and unreliable (page 32/33)

themselves no record exists, save that of oral tradition as to their origin. The Khyoungtha alone are possessed of a written language, They have among them several copies of the Raja wong, or History of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The Tongtha, on the other hand possess no written character, and the languages spoken by them are simple to a degree expressing merely the wants and sensations of uncivilized life. The information obtainable as to their origin and past history is therefore naturally meagre and unreliable (Page 32/33).

বাংলা ঃ 'এই চিঠিগুলো লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে পাওয়া। এগুলো পাওয়ার পর প্রায় সাথে সাথেই আরাকানের সর্দারের পরিচালনাধীন একদল সশস্ত্র বর্মী সৈন্য আমাদের শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রধান ঐ একই জুন মাসে বাধ্য হয়ে বড় লাটের উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এটা লিখে পাঠান যে, তাকে মৈত্রী রক্ষায় অবজ্ঞা করা হয়েছে। যদ্দরুণ আগে সশস্ত্র সৈনিকদের প্রত্যাহার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, শরণার্থীদের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে হবে। তাতে এটাও যোগ করেন যে, উক্ত পলাতক লোকজন আরাকানে বহুবিধ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জনৈক চাকমা সর্দার যিনি আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি নিজেই গ্রেফতার করে ধরে রেখেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেন যে, উক্ত সর্দার ও তার পরিচালনাধীন উপজাতীয় লোকদের নীচু সমতল ভূমিতে শান্তিপুর্ণ চাষাবাদেও আগ্রহ নেই। তারা ইতিমধ্যে পাহাড়ে ও বনে আস্তানা গড়ে নিয়েছে, যাতে লুট পাট করার সুবিধা হয়। এর দশ বছর আগে ১৭৭৭ খ্রীঃ সালের ৩১ মে তারিখের আরেকটি চিঠি যেটি চট্টগ্রামের তদানিন্তন প্রধান কর্তৃক সম্মানিত বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তাতে আছে, কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক আরাকান থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রধান প্রশাসক মিঃ বেটম্যান কর্তৃক পুনর্বাসন দানের আশ্বাসে উদ্বীপ্ত। দেশ ত্যাগের এ জাতীয় প্রামাণ্য ঘটনাবলী বর্মী কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল। মেকফার্লেন লিখিত ইতিহাস পুস্তক বৃটিশ ইন্ডিয়ার ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ১৭৯৫ খ্রীঃ সালে আরেকবার ৫০০০ বর্মী সৈন্যের একটি বাহিনী কিছু বিদ্রোহী উপজাতীয় সর্দারকে, যাদেরকে তারা ডাকাত বলে, ধাওয়া করে বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে হানা দেয়। আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী ঐসব সর্দারদের কয়েকজনকে তখন বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করাও হয়। তখন তাদের মোট তিনজনের দু'জনকে ভীষণ উৎপীড়নের দ্বারা মেরে ফেলা হয়।

মেক ফার্লেন আরো উল্লেখ করেন, ১৮০৯ খ্রীঃ সালেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে

বিরোধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঐসব সংঘাত সংঘর্ষ কমই সফলকাম হতে পেরেছে বা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। (উইলসন্স লিখিত 'নেরেটিভ অফ দি বার্মিজওয়ার' পৃষ্ঠ ২৫)

ঐ সময় সংঘটিত ঘটনাবলী ১৮২৪ সালের যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলে। দেখা যায় এসব অশান্তির সূচক হলো এমন একটি কারণ, যা বর্মীদের ধৈর্য্যচ্যুত আর দোষ গ্রহণে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহে সে কারণটি হলো ঃ উপজাতীয় লোকদের স্বদেশ ত্যাগ করে, আমাদের পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ, যা তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

উপজাতীয় মৌলিকত্বের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ। পেম্বারটন তাদেরকে মালয়ী বংশোদ্ভুত বলে নির্ণয় করেন। কর্ণেল স্যার এ ফেইর অনুমান করেন, আরাকানের প্রধান যে দুটি উপজাতি, যাদের অনেককে এই পাহাড়াঞ্চলেও পাওয়া যায়, তারা মূলতঃ মায়াম্মা বা বর্মী লোকোদ্ভুত। এই উপজাতীয়দের নিজেদের মৌখিক পুরাকাহিনী ব্যতীত মূল তথ্য বৃত্তান্তের কিছু লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্তব্য নয়। খিয়াংথা পরিচিত লোকদেরই কেবল লিখিত ভাষা আছে। তাদের কাছে বহুসংখ্যক রাজাওং বা আরাকানের রাজাদের ইতিহাস নামক পুস্তিকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি তাদের প্রবাস ও পর্বতবাসের জীবন বৃত্তান্তের উপর কোন তথ্যই অবগত হতে পারিনি। অপর পক্ষে টংথা নামীয়রা কোনরূপ লেখশৈলীর অধিকারী নয়। তাদের কথাবার্তা হলো কোন মতে চাহিদাকে ব্যক্ত করা যা অসভ্য জীবনের অভিব্যক্তি। তাদের মৌলিকত্ব আর অতীত ইতিহাসের তথ্য স্বভাবতই অপ্রতুল আর অবিশ্বাস্য। (সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ৩২/৩৩)।

খ) মিঃ বি আর পার্নের উদঘাটিত তথ্যটি এবার প্রণিধানযোগ্য যথা ঃ

Thirteen years before, at the time of the Mogh migrations of 1798, an Arakanese chief who known to the English as ``Moorusugeeree'' had fled into Chittagong, followed by many adherents for he had been popular with his people, It was he who had invited King Bodawpaya to seize the crown of Arakan, but he had quarrelled with the Burmese and had settled. with the permission of the company's offcers at Harbang. The English knew him as ``Moorusugeeree'', which they thought was hid name, whereas it is evidently the titlle ``Myothugye'', His real name was Nga Than De. He had a son named Chin pyan, who was called by the English ``King Bering'' or ``King Burring'' Chin pyan's own account of his father and of himself is as follows.

In 1145 Mogh the country of Arakan was over run with plunderers. In consequece my father addressed a letter to the King of Ava, who sent an army and took possession of Arakan. The

King looking on my father as a person of royal blood, put him in possession of the Govrnment of Arakan, retaining only the name of sovereign to himself. In 1160 (Mogh) the said king demanded from my father a quota of 20,000 muskets and 40,000 men to make war on Siam. My father consented to furnish the half of this demand. The King was angry at not getting the whole, and seized my brother and killed him. On this account my father with his relatives and friends, and all his adherents consisting of most of the inhabitants of that country, emigrated. My father died. We sought refuge in the English territory, and I concealed myself at Harbang. Mr. Cox at this time came to Ramoo by order of the Government and distributed food and implements for cutting the jungles to all the Mogh. They cultivated the ground and thus earned a subsistence. Mr. Cox made every search for me, but through the operation of my civil destiny he did not find me. After the death of my father my mother took every thing he possessed. I got nothing.

Chin Pyan's father had appparently before he fled to Harbang owned an area of land near the banks of the Naaf river, which formed the boundary between Indian and Burmese territory. This land derived from its owner the name of moorusugeeree when he fled from arakan. Nga Than De had abandoned his property. but early in the year 1811 chin pyan left Harbang and took possession of it, professing to act as agent for a Mohammedan, ``Saddodeen Chaudry, who had induced the Collector of Chittagong to give him documentary recognition of his ownership, although, it would appear, the Collector did not know exactly where the land was.

(Ref : Journal of Burma Research Society the King Bering page 44/48) Dated 23.11.1933.

বাংলা ঃ 'মগদের ১৭৯৮ খ্রীঃ সালে অনুষ্ঠিত স্বদেশ (আরকান) ত্যাগের তের বছর আগে একজন আরাকানী সর্দার, যিনি 'মুরুসুগিরি নামে ইংরেজদের কাছে পরিচিত ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। বহু সংখ্যক অনুসারী ও তার সঙ্গী হয়! তিনি নিজের ঐ জনগণের মাঝে জনপ্রিয় ছিলেন। বার্মার রাজা বোদাওপায়াকে আরাকানের সিংহাসন দখলের জন্য তিনিই আহ্বান করে ছিলেন। তবে তিনি বর্মীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে

পড়েন, ফলে (ইষ্ট ইন্ডিয়া) কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অনুমতিক্রমে তিনি হারবাং অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইংরেজরা তাকে মুরুসুগিরি/মইসাগিরি হিসাবেই জানতো, যা তার নাম বলেই তাদের ধারণা ছিলো। অথচ এ প্রমাণ আছে যে তাঁর উপাধি মাইয়োথুগ্যি আর আসল নাম ছিলো গো শান দে। চীন পিঁয়া নামীয় তার একজন ছেলে ছিলো, যাকে ইংরেজরা রাজা বেরিং বা বারিং নামে ডাকতো। চীন পিঁয়ার নিজের বর্ণনায় তাঁর বাবা ও নিজের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

১১৪৬ মঘী সনে (১৭৮৪ খ্রীঃ) আরাকান দেশটি অরাজক লোকদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে, সে পরিস্থিতিতে, আমার বাবা আভার রাজাকে একখানা চিঠিতে আহ্বান করেন, যিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে আরাকান দখল করে নেন। রাজা আমার বাবাকে রাজরক্তের অধিকারী দেখে আরাকান সরকারের প্রাধান্য দান করেন, এবং নিজের অধিকারে শুধু সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাই ধরে রাখেন। ১১৬০ মঘী সনে (১৭৯৮ খ্রীঃ) শ্যাম দেশের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজা আমার বাবার কাছে ২০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী চেয়ে পাঠান, তাতে তিনি অর্ধেক পর্যন্ত দাবী পূরণের সম্মতি ব্যক্ত করেন। পরিপূর্ণ দাবী পূরণ না হওয়াতে রাজা রুষ্ট হোন ও আমার ভাইকে আটক এবং হত্যা করেন। এহেতু বাবা নিজের সমূদয় স্বজন পরিজন ও অনুসারীদেরসহ স্বদেশ ত্যাগ করেন, যারা সংখ্যায় ছিলেন, সে দেশের গরিষ্ঠ অধিবাসী। বাবা মারা যান। আমরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ ও আমি নিজেকে হারবাং অঞ্চলে গোপন করি। মিঃ কক্স এ সময় সরকারের আদেশে রামুতে আসেন এবং মগ বসতির ভিতর জঙ্গল পরিষ্কারের সরঞ্জাম ও খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করেন। তারা জমিগুলোতে চাষাবাদ শুরু ও তাতে জীবিকার সংস্থান করে নেয়। মিঃ কক্স গভীরভাবে আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত হোন। কিন্তু আমার প্রকাশ্য আস্তানার সন্ধান ও আমার সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হোন। আমার বাবার মৃত্যুর পর, তার পরিত্যক্ত সব কিছুই আমার মা নিজে হস্তগত করে নেন। আমি তার কিছুই পাই নি।

'হারবাং অঞ্চলে পলায়নের আগে নাফ নদীর তীরে চীন পিয়াঁর বাবার বিশুদ্ধ মালিকানাধীন এক খন্ড ভুসম্পত্তি ছিলো, যা ভারত ও বার্মার মধ্যবর্তী সীমান্ত চিহ্নিত করে। এ জায়গাটি তার মালিকের পরিচয় বহন করে একই মুরুসুগিরি নামে অভিহিত হতো। আরাকান ছেড়ে আসার সময় গো শান দে ঐ জায়গাটিও পরিত্যাগ করেন। ১৮১১ খ্রীঃ সালের শুরুতে চীন পিঁয়া হারবাং ত্যাগ করে, এই বলে ঐ জায়গাটির দখল নেন যে, তিনি জনৈক মুসলিম সাদুদ্দীন চৌধুরীর প্রতিনিধি, যিনি চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্মকর্তাকে এ জমির মালিকানা দলিল অনুমোদনে বশিভূত করেন। যদিও মনে হয় ঐ রাজস্ব কর্মকর্তা জায়গাটির অবস্থান কোথায় তা সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না।'

(সূত্র ঃ জার্নাল অফ বার্মা রিসার্চ সোসাইটি পৃঃ ৪৪/৪৮ তাং ২৩/১১/১৯৩৩ খ্রীঃ)

তৎপর মিঃ বি আর পার্ন, বর্ণিত চীন পিঁয়া ও তার অসংখ্য অনুসারীদের দ্বারা বাংলার সীমান্ত অভ্যন্তরে ও আরাকানের গভীরে উপর্যুপরি অরাজকতা ও অভিযান পরিচালনা, তদ্দ্বারা বার্মা সরকারের সাথে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধের বর্ণনা প্রদান করেছেন।

কাল। চাকমা ইতিহাস হলো ঃ আদি চাকমা রাজা শের মস্ত খাঁর নিঃ সন্তান মারা যাওয়ার পর. ১৭৫৮ সালে আরাকান বাসী জ্ঞাতি ভাই বর্ণীত শের জব্বার খাঁন উত্তরাধিকারী রূপে রাঙ্গুনিয়া বাসী শের মস্ত খাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন, এবং ১৭৬৩ বা ১৭৬৫ সালে তিনিও পরলোক গমন করেন। ভারতীয় ইতিহাস হলো ঃ ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন ঘটে। তৎপরবর্তী নবাব মীর কাসেম আলী খান ১৭৬০ সালে প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের ব্যয় নির্বাহে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে মেদিনীপুর চব্বিশ পরগণা ও পার্বত্য অঞ্চলসহ চট্টগ্রামের দেওয়ানী ও নেজামত হস্তান্তর করেন।'

এই দুই তথ্য সুত্রে অকাট্যভাবে অবগত হওয়া যায়ঃ জাতিগতভাবে চাকমা ও তাদে: রাজাদের বৃটিশ আমলের শুরুতেই আরাকানের রোসাং অঞ্চল থেকে এতদাঞ্চলে আগমন ঘটেছে এবং ঐ রাজারা ইসলাম ধর্মানুসারী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ বিবরণটি চাক্মা সমাজের পক্ষে অপ্রিয়, তবে তথ্য হিসাবে চূড়ান্ত সত্য সীলমোহর হলো অভ্রান্ত প্রমাণ সুত্র। সন্দেহ হলে এটির পাঠ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পুনঃ পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবু এর ভিন্নতা হবে না বলেই আমার অর্জিত মাস্টার পর্যায়ের আরবী জ্ঞানের দ্বারা আমি নিশ্চিত।

স্থানীয় দ্বিতীয় প্রধান সম্প্রদায় মগ বা মারমাদের ঐতিহাসিক জাতীয় অঞ্চল হলো আরাকান ও বার্মা। তাদের আগমন ও নির্গমন ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। তাদের জাতীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম বা পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। অতীতের রাজ্যাভিযানের সাথে তাদের কারো কারো সম্পৃক্ততা থাকা সম্ভব, তবে বৃহদাংশ যে বার্মা ও আরাকানের পারস্পরিক যুদ্ধাভিযানে আগত শরণার্থীদের বংশধর তা নিশ্চিত। বৃটিশ আমলের আগে মগ দলপতি কংহ্লা প্রু, এতদাঞ্চলীয় শেষ আরাকানী শাসক ছিলেন, এবং ১৭৫৬ সালে নাফ নদী কূলের শেষ অবস্থান মোগলদের হাতে হারিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি স্বদেশে ধিকৃত হয়ে কিছু সঙ্গী সাথীসহ ১৭৭৪ সালে প্রত্যাবর্তন করে বৃটিশদের অধীনে রামুর ঈদঘরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ সালে বার্মা ও আরাকানের পারস্পরিক যুদ্ধ শুরু হলে, এদেশে আরাকানী উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। ঐ দলের একাংশের নেতা হলেন জনৈক ম্রা-চাই। এই দুই মগ নেতৃ-বংশই যথাক্রমে বোমাং ও মাং সর্দার গোষ্ঠী। সুতরাং মগেরাও স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়। স্থানীয় অধিকাংশ চাকমা পূর্বপুরুষেরা ঐ আরাকানী স্মরণার্থী দলেরই লোক। পর্বতাঞ্চলে তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায় ত্রিপুরাদের আদি জাতীয় অঞ্চল হলো পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য। এখানে তারা বহিরাগত। অতীতের রাজ্যাভিযান সুত্রে তাদের কিছু লোক প্রাচীন বাসিন্দা হলেও তা চিহ্নিত নয়। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিদের আগমন নিমর্গমন ও বহিরাঞ্চল থেকে ঘটেছে। তাদের সংস্কৃতি ভাষা ও ঐতিহ্যের কোনটাই স্থানীয় নয়, বহিরাঞ্চলীয়। অতীত বিবরণে কুকিদের উৎপাত ও বসবাসের কথা পাওয়া গেলে ও তারা এখন স্থানীয়ভাবে নগণ্য এক জনগোষ্ঠী। এদের কোন রাজনৈতিক গুরুত্বই নেই।

চাকমা ইতিহাস ও তার তথ্য ভিত্তি

প্রচলিত চাকমা ইতিহাস প্রধানতঃ কিছু লোকগীতি ও কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে রচিত। বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিগ্রাহ্য, সমসাময়িক ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত, বা প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে তা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ নয়। তবু যুক্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিচারে অনেক কাহিনী ইতিহাসের মর্যাদাসম্পন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যুক্তিগত কারণে অনেক বর্ণনাই অতিরঞ্জিত বা কল্পকাহিনীর সমষ্টি। বর্তমানে উদঘাটিত প্রামাণ্য দলিল প্রমাণগুলো, ইতিহাসের নামে প্রচলিত, চাকমা পুরা কাহিনীর অনেক কিছুই নাকচ করে দেয়। সাথে সাথে সে পুরাকাহিনীর অনেক কিছুই ইতিহাসের স্বীকৃতিও লাভ করে। যুক্তি ও বাস্তবতার বিচারে কিছু কাহিনীকে অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট বলার উপায় নেই। কিছু কাহিনী প্রামাণ্য না হলেও যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। চাকমা পন্ডিতেরা ঐতিহাসিক প্রমাণ সূত্রগুলোর সংগ্রহ আর পরিবেশনে এ যাবত অমনোযোগী আছেন। তাদের পরিবেশিত কাহিনীগুলোর যাচাই বাছাই করা জরুরী। এটাও সঠিক যে প্রমাণ সূত্রগুলোর অধিকাংশ, তাদের দ্বারাই সংগৃহীত ও পরিবেশিত। তবে তা কমই ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা আজ তাদের রচনাগুলোকে আজগুবী রূপকাহিনী ভাবার সুযোগ হতো না।

চাকমা লোকগীতি "রাধা মোহন ধনপতি" ও "চাটিগাং ছাড়া" পালা "উবা গীতি" ও "বিজগ" ইত্যাদি মূলতঃ পুরাকাহিনীর সমষ্টি। সেগুলোতে তাদের আদি বাসস্থান, দেশান্তর, দিগ্বিজয়, যুদ্ধাভিযান, বীরত্ব, জয়, পরাজয়, প্রেম বিরহ, আবেগ, আকাঙক্ষা, রাজ্য, রাজত্ব, রাজকাহিনী ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ সেগুলো পৃথক পৃথক নামে একই মহাকাব্যের অংশ। ওগুলো মৌখিক কাব্যসাহিত্যও বটে, যার ধারক ও গায়ক হলেন, অতি সাধারণ লোক শিল্পী, যারা সমাজে "গেংকুলি" গায়ক নামে খ্যাত।

গানগুলোর রচনাকাল ও রচয়িতা অজ্ঞাত। তবে শিষ্য পরম্পরায় সুদূর অতীত থেকে মৌখিক চর্চার মাধ্যমে ওগুলো বেঁচে আছে। ওগুলো চাকমা ইতিহাসের মৌলিক উৎস। কেউ কেউ তার সাথে কিছু যোগ বিয়োগ করে, কিছু বাড়তি বর্ণনা ও নতুনত্ব দানের চেষ্টা করেছেন ও করছেন। প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায়ের রচনা "চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাস" ও বিরাজ মোহন দেওয়ানের "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত", আর অধুনা বাবু সুগত চাকমার লিখিত রচনাগুলোই সে প্রয়াসের অংশ। মনে হয় 'গেংকুলি শব্দটি জ্ঞান কলিরই অপভ্রংশ।

বর্ণিত চাকমা ইতিহাসের ঘটনাগুলোর অনেকটাই বিপরীত সূত্র, আর পারম্পরিক বর্ণনার ভিন্নতার দ্বারা বিতর্কিত। রাজা ভুবন মোহন রায় বর্ণিত রাজতালিকা, আর বাবু

ধারণাটি একটি সন্দেহ মাত্র। নামে মিল হলেও উপাধিতে দুস্তর ভিন্নতা বিদ্যমান। গিরি উপাধি ত্রিপুরা সমাজে অপ্রচলিত। ত্রিপুরী নায়কদের সময়কাল ইতিহাসের আলোকে নির্ণীত আছে, কিন্তু ঐ দুই চাকমা নায়কের সময়কাল নির্ণীত নেই। সুতরাং নামের সাদৃশ্যকে আকস্মিক ব্যাপার বলা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য এমনিতে চাকমা ইতিহাস, বিভ্রান্তি আর অতিরঞ্জনে পূর্ণ তবু তাতে কিছু বিশ্বাসযোগ্য সত্যও নিহিত আছে; যা তাদের উপাখ্যানের অভ্রান্ত ভৌগোলিক বিবরণের দ্বারা সমর্থিত হয়।

চাকমা ইতিহাসের অন্যতম জাজ্বল্যমান বিভ্রান্তি হলো ঃ লোকগীতিতে রাধা মোহনকে, যুবরাজ বিজয়গিরির সেনাপতি ও আরাকান বিজয়ী বীরের মর্যাদা দেয়া হয়েছে; অথচ তিনি রাজা ভুবন মোহন রায়ের বর্ণনায় সের মাটিয়া নামক ভিন্ন রাজার সেনাপতি। এমনি বিজয় গিরির পিতা ও ভাই এর নামের বর্ণনায় কখনো উদয় গিরি ভাই আর সমর গিরি পিতা, আবার কখনো সমর গিরি ভাই ও উদয়গিরি পিতা বলা হয়েছে। ভুবন বাবুর মতে বিজয়গিরির পিতার নাম সম্বুদ্ধ।

রাজা ভুবন মোহন রায় বর্ণিত চাকমা রাজবংশ

আলোচনার প্রয়োজনে এখানে রাজ তালিকাটি উপস্থাপন করা হল, যা পৃথক তিন বংশে বিভক্ত। সূত্রঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস।

ক) প্রথম রাজবংশ। রাজ্য ও রাজধানী কল্পনগর। (অজ্ঞাত স্থান)

১। রাজা ঃ শাক্য (পিতা)
২। রাজা ঃ সুধন্য (পুত্র)
৩। রাজা ঃ (১) লাংগলধন [(২) আনন্দ মোহন (৩) গুণাধন (পুত্র)]
৪। রাজা ঃ সুদ্রজিত (পুত্র)
৫। রাজা ঃ সমুদ্রজিত (পুত্র) (নিঃসন্তান)

(খ) দ্বিতীয় রাজবংশ। রাজ্য ও রাজধানী চম্পক নগর (অজ্ঞাত স্থান)

৬/১ রাজা ঃ শ্যামল (পূর্ববর্তী রাজার মন্ত্রী)
৭/২ রাজা ঃ চম্পাকলি (পুত্র)
৮/৩ রাজা ঃ সাধন গিরি (ঐ)
৯/৪ রাজা ঃ চেঙ্গিয়াসুর (ঐ)
১০/৫ রাজা ঃ (১) চান্দা সুর [(২) ধর্মসুর (ঐ)]
১১/৬ রাজা ঃ (১) সুমেসুর [(২) দেবাসুর (৩) বিশ্বাসুর) (পুত্র)]
১২/৭ রাজা ঃ ভীমাঞ্জয় (ঐ)
১৩/৮ রাজা ঃ সম্বুদ্ধ (ঐ)
১৪/৯ রাজা ঃ (১) বিজয়গিরি [(নিঃসন্তান) (২) উদয় গিরি (পুত্র)]

(গ) তৃতীয় রাজবংশ ও রাজধানী ঃ মইসাগিরি আরাকান

১৫/১ রাজা ঃ জনৈক সৈনিক [কন্যাঃ মানিক বি; স্বামী ঃ বাঙ্গালী সর্দার]

১৬/২ রাজা ঃ মানিক গিরি ঃ (নাতি)
১৭/৩ রাজা ঃ মাদালিয়া (পুত্র)
১৮/৪ রাজা ঃ রামা থংজ (ঐ)
১৯/৫ রাজা ঃ কামাল চেগা (ঐ)
২০/৬ রাজা ঃ রতন গিরি (ঐ)
২১/৭ রাজা ঃ কালা থংজা (ঐ)
২২/৮ রাজা ঃ শের মাটিয়া (ঐ)
২৩/৯ রাজা ঃ অরুণ যুগ (ঐ)
২৪/১০ রাজা ঃ (১) চান্দু থংজা ওরফে ঘাওটিয়া বা ঘাটিয়া [(২) সোনা বি (৩) মানিক বি (ঐ পুত্র কন্যা)]
২৫/১১ রাজা ঃ মাইসাং (পুত্র)
২৬/১২ রাজা ঃ মারিকিয়া (ঐ)
২৭/১৩ রাজা ঃ রদংছা ওরফে কদম থংছা
(ঐ)
২৮/১৪ রাজা ঃ তিন সুরেশ্বরী (ঐ)
২৯/১৫ রাজা ঃ (১) জানু [(২) রাজেম বি (৩) সাজেম বি (পুত্র কন্যা)]
৩০/১৬ রাজা ঃ সাথুয়া (নাতি), মা রাজেম বি, পিতা বুড়া বড় য়া
(কথিত পাগলা রাজা, পুত্র চানান খাঁ ও রতন খাঁ (নিহত) ও কন্যা অমঙ্গলী
৩১/১৭ রাজা ঃ ধাবানা (নাতি) মা অমঙ্গলী পিতা মুলিমা থংজা
৩২/১৮ রাজা ঃ ধারা মিয়া (পুত্র)
৩৩/১৯ রাজা ঃ মোগল্যা / মোগালা
(ঐ)
৩৪/২০ রাজা ঃ (১) জুবাল খাঁ {(২) ফতেহ খাঁ (ঐ)}
৩৫/২১ রাজা ঃ ফতেহ খাঁ (ভাই)
৩৬/২২ রাজা ঃ (১) শের মস্ত খাঁ [(২) রহমত খাঁ (৩) শেরজান খাঁ (পুত্র) (রাজ ভিলার অভিবাসী)।
৩৭/২৩ রাজা ঃ শুকদেব রায় (শের মস্ত খাঁর পোষ্য পুত্র)
৩৮/২৪ রাজা ঃ শের দৌলৎ খাঁ পিং রহমত খাঁ (জ্ঞাতি)
৩৯/২৫ রাজা ঃ জান বখশ খাঁ (পুত্র) (রাজা নগরবাসী)
৪০/২৬ রাজা ঃ (১) তব্বার খাঁ {(২) জব্বার খাঁ (৩) দুলা (ঐ)}
৪১/২৭ রাজা ঃ (১) জব্বার খাঁ (ভাই)
৪২/২৮ রাজা ঃ ধরম বখশ খাঁ (পুত্র)
৪৩/২৯ রাণী ঃ কালিন্দি বিবি, (স্ত্রী)
৪৪/৩০ রাজা ঃ হরিশ চন্দ্র রায় (মা মেনকা ওরফে চিকন বি, পিং ধরম বখশ খাঁ রাঙ্গামাটিবাসী)

৪৫/৩১ রাজা ঃ (১) ভুবন মোহন রায় [(২) রমণী মোহন রায় (পুত্র)]
৪৬/৩২ রাজা ঃ (১) নলিনাক্ষ রায় [(২) বীরূপাক্ষ রায় (ঐ)]
৪৭/৩৩ রাজা ঃ ত্রিদিব রায় [(২) সুমিত রায় (ঐ)]
৪৮/৩৪ রাজা ঃ দেবাশীষ রায় (ঐ)

রাজা হরিশ চন্দ্র রায়ের মাতৃকুলের গোষ্ঠী ধাবানা, কিন্তু পিতৃকুল হল ওয়াংঝা। এখানে পিতৃগোত্র প্রদর্শিত হলঃ
গুনাই ওয়াংঝা (পিতা)
(১) কবা (২) গজা (পুত্র)
ওয়াংঝা (পিং কবা)
(১) ভলা পাথর (২) গাভুর ওয়াংঝা (পুত্র)
(১) বুন্দার খাঁ (২) রনু খাঁ (পিং ভলা পাথর)
(১) চন্দর খাঁ (২) রতন খাঁ (পিং বুন্দার খাঁ)
(১) মল্লাল খাঁ (২) বল্লাল খাঁ (৩) জালাল খাঁ (পিং চন্দর খাঁ)
গোপি নাথ পিং মল্লাল খাঁ (স্ত্রী ঃ রাজকন্যা চিকন বিবি, পিং ধরম বখশ খাঁ)
রাজা ঃ হরিশ চন্দ্র রায় (পুত্র)

দেখা যায় এদের অধিকাংশ মুসলিম নাম উপাধিতে পরিচিত। রাজা হরিশ চন্দ্রের শ্বশুর রত্ন খাঁ দেওয়ান, তাঁর উর্ধ পুরুষদের অনেকের পরিচয়ও তাই। মনে হয় বৃটিশ আমলের হিন্দু প্রভাবের গুণেই রাজা হরিশ চন্দ্র থেকে অমুসলিম নামও খেতাবের ধারা প্রবর্তিত। নতুবা ভাষা আর রাজ আচরণের মত, মুসলিম নাম করণ ঐতিহ্য, এখনো চাকমা সমাজে অনুসৃত হতো। বিকৃত আর অর্থহীন নামগুলোকে কোন ভাষার গন্ডিতে ফেলা যায় না। তবে কিছু নামের সাথে সংযুক্ত মঘী উপসর্গের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তারা মগপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন, এবং ওদের স্বকীয় বিকৃত সম্বোধনই নামের বিকৃতি ঘটিয়েছে। তবে চাকমাদের নিজ সমাজ ও রাজপরিবার সূত্রে অবিকৃত মূল নামও উপাধিগুলোর না থাকা গোলমেলে।

যে তিনটি বংশের রাজ তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকার নামগুলো সুন্দর অর্থবহ, অবিকৃত ভারতীয় এবং কোন একটিও বিদেশী ভাষাজাত নয়। গাম্ভীর্য্য আর শ্রুতি মধুরতার গুণেও, নামগুলো রাজ মর্যাদার সাথে মানানসই। তাতে এই মূল্যায়নই করা যায় যে, ঐ লোকজন ভারতীয় উপমহাদেশভুক্ত কোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন, তাই নামে ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের উত্তর পুরুষ এখানকার বাংলাদেশের বাসিন্দাদের মুখের ভাষা, অতীত পুথি পুস্তকের ভাষা, এবং লোকগীতি ও প্রবাদ প্রবচনের নতুন ও পুরাতন ভাষার আলোকে বলা যায়, আঞ্চলিক বাংলার এক মিশ্রিত রূপই চাকমা ভায়া। বিশেষতঃ মুসলমানী বাংলা, চাকমা ভাষায় আত্মস্থ হয়ে আছে। এই যোগাযোগ ও সাদৃশ্য বিস্ময়কর। লক্ষ্য করার বিষয়,

ভাওয়াইয়া গানের ক্রিয়ারূপ ও চাকমা ভাষার ক্রিয়া গঠন পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। সর্বনামের বেলায় প্রায় পার্থক্য নেই। নামের শেষের ধন, জিত, গিরি, সুর ইত্যাদি উপসর্গগুলো উত্তর ভারতীয় রীতিজাত। কোন চাকমা কারো প্রতি কুপিত হলে, তাকে মগধা বলে তিরস্কার করে, তাতে অনুমান করা যায়, মগধ নামের অপ্রিয় স্থানটির সংস্পর্শে একদা তাদের অবস্থান ছিলো, এবং সম্ভবতঃ ওখানকার অধিবাসীদের দ্বারা সুদূর অতীতে উৎপীড়িত হয়েছে। যেমন বাঙ্গালীরা অতীতের অত্যাচারী বর্গীদের কথা উষ্মার সাথে স্মরণ করে, এবং এখনো ছড়া কাটে, "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে"। তৃতীয় রাজবংশের নাম ও পদবী পূর্বানুসৃত ধারার ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় রাজবংশ পর্যন্ত নাম উপাধিগুলো অনেকাংশে অমুসলিম ভারতীয়। তৃতীয় বংশের প্রথম রাজকন্যা মানিক বি'র বি পদবি মুসলিম বিবি শব্দের অপভ্রংশ। তার স্বামী বাঙ্গালী সর্দার স্বরূপেই বাঙ্গালী। সুতরাং বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজার পক্ষে, নিজের মেয়ে ও জামাতার মত নামানুসারী হওয়াই সম্ভব। তৎপর তাদের পরবর্তী মানিক গিরি অবশ্যই পারিবারিক গন্ডিতে পড়েন। এরপর দীর্ঘ বিকৃত নামের তালিকার সাথে মঘী উপসর্গ আর উপাধির সংযোগে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, যার মূলোদঘাটন অসম্ভব না হলেও কষ্টকর। তবে লুকিয়ে থাকা অমুসলিম নাম খেতাব আর উপসর্গগুলো, সে মূলোদঘাটনের সহায়ক। তা থেকে বিকৃত নাম ও উপাধিগুলোর খাঁটি মূল স্বরূপে চিহ্নিত এবং উদ্ভাসিত হয়। সম্ভবতঃ বিকৃতি ও মঘী উপসর্গগুলো বিজাতীয় উচ্চারণ ও সংমিশ্রণের ফল। অনেক ক্ষেত্রে বিজাতীয় লেখন ও বর্ণান্তর ঘটিত বিভ্রাটে, বিকৃতিগুলো জটিল হয়েছে। বাঙ্গালী, সর্দার, বিবি, মানিক, শের, রতন, খাঁ, কামাল ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে মুসলিম চরিত্র পরিস্ফুটিত হয়। ঐ নামগুলোর অমুসলিম মূল উদ্ভাবনের কোন উপায়ও নেই। তাই ভিন্ন চিন্তা অবান্তর। যদি ধরে নেওয়া যায়, নামগুলো সরাসরি ও পরিষ্কার মুসলিম চরিত্রযুক্ত নয় বলে অমুসলিম, তা হলে তার আগের ও পরের সরাসরি মুসলিম নাম ও উপাধিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য থাকে না। বিকৃত আর অর্থহীন নাম উপাধি, অজ্ঞ আর সাধারণ লোকের পক্ষেই ধারণ করা সম্ভব। গর্বিত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের অলংকারপূর্ণ গম্ভীর নাম উপাধি ধারণের নজির খোদ ঐ রাজবংশেই বিদ্যমান। অর্থহীন ও সংগতিহীন বলেই অমুসলিম নাম উপাধিগুলো তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অযোগ্য। আর এ কারণেই বটে, মুসলিম নাম উপাধিসমূহ, ঐ বিকৃত নাম উপাধিগুলোর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য। বিকৃত নাম উপাধিগুলো মৌলিকভাবে মুসলিম চরিত্র সম্পন্ন। তা রাজকীয় মর্যাদার সাথেও সঙ্গতিশীল। পরিচয়-জ্ঞাপক অযোগ্য নাম উপাধিতে উপহাস্য হওয়া কোন রাজপুরুষের পক্ষেই মানানসই নয়। সুতরাং এই মূল্যায়নের দ্বারা, সংগতভাবেই ধারণা করা যায় যে, তৃতীয় চাকমা রাজবংশের প্রথম সতেরজন রাজা, তাদের রাজকীয় মর্যাদার পক্ষে সংগতিপূর্ণ নাম ও উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, অথবা তারা আদৌ রাজা বা মর্যাদাসম্পন্ন কেউ ছিলেন না, যা তাদের অর্থহীন বিকৃত নাম উপাধিতে বিবৃত হয়। সম্ভবতঃ কোন ক্ষমতাধর

উচ্চাভিলাষী বংশধর, নিজেদের উচ্চ মর্যাদা ও কৌলিন্যের উচ্চাশা পূরণার্থে রাজ তালিকাটি বর্ধিত করেছেন। অনুরূপভাবে অসন্তুষ্ট কেউ মুসলিম নাম পদবিতে, বিকৃতি ঘটিয়েছেন। যে কারণে দেশী বিদেশী সাকুল্য রাজসংখ্যা, এখন আটচল্লিশের এক বিরাট সংখ্যায় উপনীত। এই বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ঘটনা হলো রাজক্ষমতার দাবীদার ধাবানা কর্তৃক তৈনছড়িতে বাঁশের সিংহাসন ব্যবহার, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ধূর্য্যা কর্তৃক স্ত্রীর বক্ষবন্ধনীর দ্বারা মাথায় পাগড়ি বাঁধন, এবং রাজপরিবারের মেয়েদের লাকড়ি কাটা ও মাছ ধরা ইত্যাদির যে বর্ণনা বিভিন্ন উপাখ্যান ও কিংবদন্তিতে আছে, তা অতি সাধারণ লোক হওয়ার প্রতীক।

বিকৃত নাম পদবিধারী রাজাদের বংশে অনেক উত্তরপুরুষ সরাসরি খাঁটি আর অবিকৃত নাম ও খেতাবে পরিচিত। তাতে তাদের বাপ দাদাদের পরিচয় সন্দেহমুক্ত হয়, যথাঃ দশম পুরুষ রাজা চান্দুর দুই বোন সোনা বি ও মানিক বি ও ষোড়শ পুরুষের দুই ছেলে চানান খাঁ ও রতন খাঁ ইত্যাদি।

বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায়, চাকমারা কল্পনগর ও চম্পকনগর বসবাসকালে, ধন, জিত, সুর, গিরি ইত্যাদি নাম বিশেষণ ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের আভিজাত্যের পরিচয় দিচ্ছেন। আরাকান থাকাকালে তারা ব্যবহার করেছেন থংজা, চেগা এবং অনুস্বর বর্ণীয় মঘী উপসর্গ। এবং মুসলিম বাংলায় বেছে নিয়েছেনঃ মিয়া, বিবি ও খাঁ উপাধি। আবার ইংরেজ আমলের হিন্দু প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে রায়ে রূপান্তরিত হয়েছেন। এটা তাদের পরিচয় বদলের পারঙ্গমতার নজির।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৃতীয় বংশের প্রথম সতের জন রাজার নাম পদবি - খাঁটি মুসলিম মূল থেকে বিকৃত। তাদের বংশধর পরবর্তী দশজন রাজা, রাণী খাঁটি মুসলিম নাম ও পদবিতে পরিচিত। ধর্মতঃ তাদের অমুসলিম হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবতঃ নাম ও উপাধি বদলের মত ধর্ম বদলের ঘটনাও ঘটেছে, যদ্দরুন এখন তারা বৌদ্ধ। তৃতীয় রাজবংশের রাজাদের সংখ্যা এ পর্যন্ত মোট চৌত্রিশে উপনীত। পূর্বাপর বংশগুলোর হিসাবে এই সংখ্যা এখন সর্বমোট আটচল্লিশ। দেখা যায়, প্রথম দুই বংশের রাজাদের ও তৃতীয় বংশের শেষাংশের রাজপুরুষদের নামও উপাধিগুলো অত্যন্ত জমকালো, অর্থপূর্ণ, আর সুন্দর, এবং সবকয়টি সংস্কৃত ও দেশী ভাষাজাত। কিন্তু তৃতীয় বংশের সৈনিক রাজা ও তার বংশধরদের প্রথম সতেরটি নাম ও উপাধি বিভ্রান্তিকর। এদের বিকৃত আর অবিকৃত নাম উপাধিতে নিহিত কিছু মুসলিম চরিত্র, ব্যাপারটিকে বিতর্কিত করে তুলেছে। মনে হয় আসলে এই নামগুলো মুসলিম নামের বিকৃতি, এবং তারা নিজেরাও ধর্মতঃ মুসলমান ছিলেন। সৈনিক রাজা ও তার জামাতার নাম সংস্কৃত, দেশী, বা মঘী হলে, এবং মানিক বি ও তাঁর পরবর্তীদের কারো কারো ইসলামী নাম উপাধি না থাকলে, সন্দেহের সৃষ্টি হতো না। গভীর যাচাই বাছাই অধিকাংশ নামের মুসলিম চরিত্রকে প্রমাণিত করে। কিছু নাম ধর্ম নিরপেক্ষ এবং দুটি নাম সংস্কৃত বা দেশী বলে ভ্রম হয়। মনে হয় তার কিছু বিকৃতি ও কিছু লিখন ও বানান বিভ্রাটের ফল।

চাকমা নামকরণ ও গোত্র গোষ্ঠী

চাকমা নামে চিহ্নিত বিশেষ সম্প্রদায়টির পরিচয় সূত্রে চাকমা নাম শব্দটির ব্যবহারের কাল ও তার মূলসূত্র এখনো নিশ্চিত নয়। তাদের দেশান্তর, যুদ্ধাভিযান, রাজ্য, রাজত্ব, বিজয়, পরাজয়, প্রেম, বিরহ, আর সমাজ চিত্রের লোককাহিনী ও গীতিকা ভিত্তিক বিবরণের কোথাও ব্যক্তি নামের সাথে পদবীটি স্বকীয় ব্যবহারে আসেনি। বৃটিশ আমল থেকে সরকারী বিবরণে ও প্রতিবেশী বাংগালী অবাংগালী লোকজনের মৌখিক সূত্রেই তারা চাকমা সম্বোধিত। জনপ্রিয় বিভিন্ন লোকগীতি, কথাকাহিনী ও জনশ্রুতিতে বহু নায়ক নায়িকা ও চরিত্রের পরিচয়ে নামের উল্লেখ থাকলেও, সম্প্রদায়গত চাকমা পদবীটি কোথাও কোন নামের সাথে যুক্ত পাওয়া যায় না। তাতে বুঝা যায়, তাদের নামের সাথে চাকমা পদবীটির ব্যবহার প্রাচীন বা স্বআরোপিত নয়। প্রতিবেশী ও সরকারী সম্বোধনের মাধ্যমেই তারা চাকমা পরিচিত।

কিছুই কার্যকারণ বহির্ভূত ও মূলহীন না হওয়ার সূত্রে চাকমা নামটি অবশ্যই কোন মূলের সাথে সম্পর্কিত হবে। এটা নিশ্চয়ই শূণ্য সম্বন্ধযুক্ত কোন শব্দ নয়। দীর্ঘকালের সাধারণ প্রতিবেশী চট্টগ্রামী বাংগালীরা তাদের চাম্ময়া বলে। নিজেদের সম্বোধনেও তারা চাঙমা অভিহিত হয়। আরাকানেও নাকি স্থানীয় মগ ও অন্যান্যরা সে দেশবাসী চাকমাদের 'চাক' থেক, সেক ও দৈংনাক নামে ডাকে। বাংলা ভারতের অন্যত্র হুবহু এই নামের কোন সম্প্রদায়ের থাকার কথা কোন বিবরণে পাওয়া যায় না। তবে বান্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দা চাকদের কেউ কেউ নিজেদের নামের সাথে 'সাঙমা' পদবী ব্যবহার করে থাকেন। গারোদেরও একটি শাখা ঐ 'সাঙমা' নামে পরিচিত। নিকট সাদৃশ্যযুক্ত এই 'চাঙমা' ও 'সাঙমা' পদবীদ্বয় অথবা থাই দেশীয় প্রাচীন 'শ্যাম' নাম চাকমা নামের মূল হতে পারে। চাকমাকে কেউ কেউ চাকের অপভ্রংশ এবং অনেকে থেক শব্দকে আরবী শেখের বিকৃতি জ্ঞান করে থাকেন। তবে চাঙমা ও সাঙমা শব্দদ্বয় উচ্চারণে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চাকমা ভাষাকে চাটগেঁয়ে বাংলার জমজ বলা যায়, যাতে প্রচুর আরবী, ফার্সি, হিন্দী আসামী আর ভাওয়াইয়া শব্দাবলী মিশ্রিত। বিস্ময়ের ব্যাপার হলোঃ প্রাচীন চাকমা রাজাদের ব্যবহৃত সীলমোহর গুলোতে, খেমার ধর্মী নিজস্ব বর্ণ, বা বাংলা ব্যবহৃত হয়নি। একটি বাঁদে সব কটি সীলমোহরেই আরবী বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ রাজাদের অধিকাংশ মুসলিম নামও খেতাবে ভূষিত। আরাকানী রাজাদের মত তারা বিকল্প অমুসলিম নাম ও খেতাবের ব্যবহার করেননি। এই সম্প্রদায়টি অতি মাত্রায় রাজনীতি সচেতন ও আত্মম্ভরী।

অতীতে বর্তমান থাইল্যান্ড শ্যাম নামেই অভিহিত হতো। তখন চট্টগ্রামবাসী অনেকের বার্মা মালয় ও শ্যামদেশের সাথে যোগাযোগ ছিল। চাকমারা একদা দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত পথে চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও আশ্রয় গ্রহণ করে। আরাকানী ও মালয়ী সম্প্রদায় থেকে ভাষায় ভিন্ন, তাই সম্ভবতঃ আরো দূরের শ্যাম দেশীয় জ্ঞান করে প্রতিবেশী.

চট্টগ্রামী লোকেরা তাদেরকে শ্যাম্যুয়া অভিহিত করে থাকবে। পরে হয়তো তাই চট্টগ্রামী কথন রীতিতে সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়ে চাম্যুয়া এবং অবশেষে লিখিত রূপ চাকমায় পরিণত হয়েছে। তবে আমার অনুসন্ধান ও গবেষণায় চাকমা শব্দের মূল সাঙমাই নির্ধারিত হয়। অতিরিক্ত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

প্রাসঙ্গিকভাবে সর্বাধিক ষোড়শ শতাব্দী থেকেই চাকমা পদবীটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐ পদবীটি নামের সাথে যুক্ত করে ব্যবহারের সম্ভাব্য কাল হিসাবে, সর্বাধিক বৃটিশ আমলকেই চিহ্নিত করা যায়। বৈষয়িক প্রয়োজনে তখন থেকেই চাকমারা নামের সাথে ঐ সম্প্রদায় জ্ঞাপক শব্দটির ব্যবহার শুরু করেছে। এখন ভাবা দরকার, চাকমারা যে নিজেদের চাঙমা নামে পরিচয় জ্ঞাপন করে, তার আদি সূত্র সম্বন্ধ কী। অনেকের মতে মূল চাকমা শব্দটি শাক্য, শ্যাম, চাম্পা, চম্পক, শেখ, থেক, চাক, সাক, সাঙমা, চাঙমা, বা চাম্যুয়া শব্দের যে কোন একটির অপভ্রংশ।

কোন কোন গবেষক মনে করেনঃ মঘী চাঙ+মাঙ থেকে অপভ্রংশে চাকমা নামের উৎপত্তি হয়েছে। 'চাঙ' মানে হাতি 'মাঙ' মানে অধিপতি বা মালিক, অর্থাৎ হাতিওলা সম্প্রদায়। মগ প্রতিবেশী কর্তৃক প্রথমে তারা 'চাঙমাঙ' নামে আখ্যায়িত হয়েছে, তারই অপভ্রংশ চাঙমা, যা চাকমাদের নিজেদের উচ্চারিত নাম। চট্টগ্রামী বাঙালীদের দ্বারা তা খানেক পরিবর্তিত হয়ে চাম্যুয়া উচ্চারিত হয়। এটা চট্টগ্রামী কথ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য যে, নাম ও বিশেষণগুলো সংক্ষিপ্ত হয়ে ইয়া উয়া প্রত্যয় যোগান্তে উচ্চারিত হয়। যথা বুড়া>বুঝ্যা, রহিম>রম্যুয়া, এজহার>এজায্যা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে চাকমাদের স্বউচ্চারিত চাঙমা নাম, চাটগেঁয়ে ভাষায় চাম্যুয়া। এ ব্যাপারে আরেক অভিমত হলোঃ এটা সেক মঙ নামের অপভ্রংশ। আরাকানে সেক সম্প্রদায় অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে সেক ও চাকমারা আদতে অভিন্ন। মূল সেক নামের বুৎপত্তিগত ইতিহাসও এর সাথে জড়িত। মনে করা হয়, এটি আরবী শেখ উপাধির আরাকানী বিকৃতি।

আগে মনে করা হতো, চাকমা সমষ্টি মোট তিন শাখায় বিভক্ত যথাঃ মূল চাকমা, দৈংনাক ও টুংটুঙ্গা। কিন্তু আজকাল থেক বা সেক এবং মতান্তরে চাক, তাতে যুক্ত হয়েছে। মূল শাখা-প্রশাখাভূক্ত গোত্র গোষ্ঠীগুলোকে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ধারায় বিচার করা হলে, তাতে বহু ক্ষুদ্র জাতি ও উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায়। আজকাল অনোক্যা চাকমাদের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি নেই। সম্ভবতঃ ওরা অন্যান্যদের মাঝে মিশে গেছে।

চাকমারা ব্যক্তিগত গোত্রীয় ও স্থান সংক্রান্ত নাম ও উপাধি নির্বাচনে রং, রূপ, গুণ, চরিত্র ও পরিবেশ ইত্যাদিকে ব্যবহার করে থাকে। যথাঃ

ক) রং বাচক নাম ঃ ১। রাঙ্গা-চুলা ২। আগুন পূনা ৩। কালা, ৪। রাঙ্গামাটি, ৫। রাঙ্গাপানি ইত্যাদি।

খ) রূপ বাচক নাম ঃ ১। বোদা চোখী ২। সোনামুখী ৩। চান্দ বি ৪। গোলাপী ৫। আঁধার মানিক ইত্যাদি।

প্রথার মত নিজেদের জনসমষ্টিতে অন্তর্ভূক্তদের স্বতন্ত্র পরিচিতি, তাদের প্রধান চরিত্রের ভিত্তিতে, পরিচিহ্নিত করে, গোষ্ঠীর আকারে জন বিভাগের প্রবর্তন করেছে। যাতে ভবিষ্যতে কে কোন সম্প্রদায় ও সমাজের লোক, তা চিহ্নিত থাকে। গত আদমশুমারীগুলোর হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিগুলোর বৃদ্ধি না ঘটা ও হ্রাস পাওয়া প্রমাণিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে, অরাজক উপজাতিদের দমনের দ্বারা ব্যাপক হত্যা উৎপীড়ন ও বাস্তুত্যাগ ঘটা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও দেশের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও তখনকার কোন বিবরণেই বিবৃত হয়নি। এমনতর ঘটনায় অবশ্যই রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হতো। এটা নীরবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। আরাকানী উদ্বাস্তুজনিত কারণে বৃটিশে ও বার্মায় বাদ প্রতিবাদ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আসামে ও আরাকানে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং এটা মান্য নয় যে, কুকিসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিরা সরকার কর্তৃক বিতাড়ন ও নির্মূলকরণের শিকার হয়েছে। যদ্দরুন তাদের সংখ্যা বাড়েনি, বা হ্রাস পেয়েছে এবং এর বিপরীতে চাকমাদের নিরাপদ অত্যধিক জন্মহারই অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। ক্ষুদ্র উপজাতিদের গ্রাসকরণ ছাড়া চাকমাদের মাঝে বিজাতীয় গোত্র গোষ্ঠীর উদ্ভব হতে পারে না। আর এটাই ক্ষুদ্রদের বৃদ্ধি না ঘটা, সংখ্যা হ্রাস পাওয়া ও চাকমাদের সংখ্যা বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতার অন্যতম যুক্তি গ্রাহ্য কারণ বলা যায়।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ স্বীয় চাকমা জাতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, চাকমা রাজা অরুণ যুগের রাজধানী ছিলো উচ্চ ব্রহ্মের মইসা গিরি নামক স্থানে। তার সাথে মগ রাজা মেংদির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, রাজা, তিন রাণী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা এবং দশ হাজার স্বজাতি প্রজা বন্দী হোন। মগ প্রধানমন্ত্রীর পুত্র কনিষ্ঠা রাজকন্যাকে ও রাজা মেংদি নিজে জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন। বন্দি প্রজাদের ইয়ংখ্যং অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়। অনুরূপ আরো ঘটনায় মগদের সাথে চাকমাদের সংঘাত ও সামাজিক সংমিশ্রণ ঘটা সম্ভব। চাকমাদের সাথে ত্রিপুরাদের একিভূত আর অভিন্নতার বিবরণ মিঃ ফেইরকৃত হিষ্টরী অফ বার্মায় নিম্নাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

"যখন মেংবেং (ওরফে জেবকশাহ ১৫৩১-৫৩ খ্রীঃ) অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন, তখন উত্তরাগত জনৈক থেক রাজা, যাকে ত্রিপুরার অধিপতি জ্ঞান করা হয়, রামু পর্যন্ত অধিকার করেন। সূত্র : বার্মার ইতিহাস : পৃ: ৭৯ মিঃ ফেইর।

এতে বুঝা যায়, থেক জ্ঞাত চাকমারা পরিচয়ে ত্রিপুরাদের সাথে সম্পর্কিত। চাকমা কিংবদন্তিতেও স্বীকার করা হয় : রাজা সাথুয়া, প্রকাশ পাগলা রাজার মেয়ে অমঙ্গলী, জনৈক ত্রিপুরা কর্তায্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। এই পক্ষে জন্মলাভ করেন পীড়া ভাঙ্গা, যিনি তৈনছড়ি চাকমা রাজ্যের সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার ছিলেন। এই সূত্রে মূল কুলিন চার চাকমা গোত্রের অন্যতম হলো : পীড়া ভাঙ্গা গোত্র। এরা পিতৃ রক্তের সুবাদে মূলতঃ ত্রিপুরা।

চাকমাদের সমাজ বিস্তারের অতিরিক্ত প্রমাণ হলো : মূল চার গোত্র থেকে প্রসারিত হয়ে তা এখন ৩৪ গোত্র আর ১৭২টি উপগোত্রের সমষ্টি। আদি ধূর্য্যা, কুর্য্যা, ধাবানা ও পীড়া ভাঙ্গাই সব গোত্র আর উপগোত্রের মূল নয়। স্বতন্ত্র ৩৪টি ও তার বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়ে চাকমা সমষ্টি গঠিত। বর্ণিত চার রাজ পুরুষকে তৈনছড়ি সিংহাসনের প্রতিযোগী পাওয়ার সূত্রে এটা নিরুপিত হয় যে, এরা মৈসাং রাজার বংশধর পরবর্তী পুরুষ। প্রতি ২০/ বছরে এক পুরুষ ধরা হলে, কিংবদন্তীয় কর্মকাল প্রায় দু'শত বছরে ব্যাপ্ত হয়। তাতে মৈসাং এর আরাকান ত্যাগের ঘটনাকাল পঞ্চদশ খ্রীঃ সন এবং ধাবানাদের সময়কাল হয়ে দাঁড়ায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল। সে থেকে গত তিনশত বছরে গোত্র গোষ্ঠীগুলো বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌছেছে। ধাবানাদের দুপুরুষের মাথায় রাজা মোগল্যার অবস্থান থাকায়, এই হিসাবেও তা মোগল আমলে পড়ে। সুতরাং ভাবার অবকাশ আছে যে, এই সময়ের ভিতর বিপুল সংখ্যক লোকের চাকমা সমষ্টিভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক জন্মগত বৃদ্ধি কিনা।

চাকমা পদবির মূল সন্ধান

আগেই বর্ণিত হয়েছে, এ পদবিটির উৎস বর্ণনায় চাকমা পন্ডিতদের সহ অনেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে আমি যে ভিন্ন মত পোষণ করি, তার সূত্রসম্বন্ধ ভিন্ন। চাকমাদের চাঙমা এবং গারো আর চাকতের সাঙমা উপাধি, আমাকে এই তিন দল লোকের অভিন্ন মূল আর একই পদবিধারী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে প্রলুব্ধ করে।

আমার এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে, চাকমাদের লোকগীতি ও কাহিনী ভিত্তিক দেশান্তর বর্ণনা ও সাম্প্রতিককালের পত্র-পত্রিকাভিত্তিক দুটি বিবরণ উপস্থাপনযোগ্য।

ক) লোককাহিনী ভিত্তিক সমর্থন

চাকমা লোককাহিনী হলো : হিমালয় দক্ষিণের কোন এক কল্পনগর থেকে চাকমা পূর্ব পুরুষেরা বিতাড়িত বা স্থানান্তরিত হয়ে, হিমালয় পূর্ব ঢালের ইরাবতী নদী উপত্যকায় চম্পক নগর নামক নতুন এক রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করেন। একদা ঐ রাজ্যের যুবরাজ বিজয় গিরি, সাত চামুচ বা ছাব্বিশ হাজার সৈন্য সহ দিগ্বিজয়ে বাহির হোন। নদী পথে ছয় দিবা রাত্রি যাত্রার পর তারা তেওয়া নামক নদীর তীরে কালাবাঘায় অবতরণ করেন, ও তা বিজিত হয়। কোন কোম বর্ণনায় আছে, পরবর্তী যাত্রায় ঘাগট নামীয় একটি নদীও তাদেরকে পাড়ি দিতে হয়েছে। তৎপর তাদের যাত্রা পথে খৈ গাঙ, তিবিরা, মেঘনা দয্যা, চাটিগাঙ, হাঙরকূল, অকসাদেশ, কালিঞ্জর, কুকি রাজ্য, মগ রাজ্য এবং যুদ্ধাভিযানে সে সব অঞ্চল জয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। লোকগীতিতে এই বিশাল দিগ্বিজয়ে ১২ বছর কাল অতিক্রান্ত হয়। সেনাপতি রাধামোহন স্বদেশ চম্পক নগর ফিরে যান। রাজকুমার ফিরতি পথে খবর পান যে, পিতা বৃদ্ধরাজা সমর গিরি তিরোধান করেছেন এবং তদস্থলে ছোট ভাই উদয় গিরি রাজা ঘোষিত হয়েছেন। তাই ভাই ও স্বজাতিদের সাথে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য তিনি স্বীয় বিজিত রাজ্যে ফিরে যান

এবং স্থানীয় মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পেতে সৈন্যদের বিজিত দেশে থেকে যেতে নির্দেশ দেন এবং নিজেও একজন আরি মহিলাকে বিবাহ করেন। (সূত্র : চাকমা রাজ কাহিনী, রাধা মোহন ধনপতির পালা, ভাটিগাং ছাড়া পালা ইত্যাদি)

পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই যাত্রা বা অভিযান হিমালয়ের দক্ষিণ বা পূর্ব ঢাল থেকে শুরু হয়ে আরাকানে পৌঁছে শেষ হয়েছে। এর মধ্যাঞ্চলে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা অবস্থিত। এই বিস্তৃত অঞ্চলটি নির্বিঘ্নে ও স্বল্প সময়ে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তেওয়া মানে করতোয়া আর কালা বাঘা মানে করতোয়া মোহনার ভাটিতে অবস্থিত বাঘা অঞ্চল হওয়াই সম্ভব। ঘাঘট নদীটিও হুবহু একই নামে তার উজানে গাইবান্ধায় অবস্থিত। এতে বুঝা যায়, সুদূর অতীতে উজানের হিমালয় ঢাল থেকে কোন কারণবশতঃ এই সম্প্রদায়ের একদল অভিযাত্রী করতোয়ার ভাটি পথে বাঘা পর্যন্ত ছয় দিন ছয় রাত্রি ধরে যাত্রা করেছেন। সেই প্রাচীন যুগে পাহাড়ী লোকের যাত্রার বাহন বাঁশ গাছের চালি হয়ে থাকলে, তাতে ছয় দিন ছয় রাত্রি লাগাই সম্ভব। তৎপর দ্বিতীয় যাত্রা স্থল খৈগাঙ বা খোয়াই নদী ও ত্রিপুরা অঞ্চলে যেতে তাদেরকে যমুনা ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে পূর্ব তীরবর্তী গারো অধ্যুষিত এলাকাসমূহ অতিক্রম করতে হয়েছে। সম্ভবতঃ মত বিরোধ বা উপদলীয় কলহে সেখানে তাদের মাঝে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে বিচ্ছিন্ন একটি শাখা, গারো পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে থেকে যায়। তৎপর অবশিষ্টরা ত্রিপুরার দিকে প্রস্থান করে। তারা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল হয়ে মধ্যবর্তী সমতল পাড়ি দেয়। তারই নিদর্শন হলো সরাইলের চাকমার গ্রাম ও শাহবাজপুরে চম্পকনগর নামীয় পাড়ার অবস্থিতি। তারপর খোয়াই ত্রিপুরা মেঘনা চাটিগাঙ, কুকি রাজ্য, কালিঞ্জর হাঙরকুল, ওকসা দেশ ও মগ রাজ্য ইত্যাদি আরাকান পর্যন্ত পর পর প্রায় অবিকৃত নামে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত আছে। শেষ প্রান্তে চাক বা থেক। চাকমাদের আরেক বিচ্ছিন্ন শাখাই হবে। সম্ভবতঃ মগ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, অধিকাংশ চাকমা আরাকান ত্যাগ করলেও থেক বা চাকেরা দ্বিমতবশতঃ নিজেদের অবস্থান অব্যাহত রাখে। পরে ভিন্ন অবস্থানগত কারণে তাদের স্বজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি এবং জন্মগত বিশুদ্ধতার প্রাচীন ঐতিহ্য লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই বর্ণিত তিন শাখার মাঝে ভাষা ও সংস্কৃতিতে ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। অজান্তে অলক্ষ্যে অভিন্ন পরিচয়ের অবশেষ, সাধারণ ভিন্ন উচ্চারণে সাঙমা ও চাঙমা পদবি বেঁচে গেছে। এই যোগসূত্র বিস্ময়কর হলেও অবিশ্বাস্য নয়। আর এটাই বিস্ময়কর যে, যাত্রা পথের ভৌগোলিক নামগুলো অশিক্ষিত লোক গীতিগায়ক গেংকুলিদের মুখে ব্যক্ত হয়, যাদের এত ব্যাপক ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা অসম্ভব। সুতরাং ভৌগোলিক বাস্তবতার গুণেই বর্ণিত চাকমা দেশান্তর কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা মান্য। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় কাব্যিক অতিরঞ্জন ঘটা স্বাভাবিক। তাই দ্বিগ্বিজয় সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোকে উৎসাহবর্ধক সংযোজন ভাবা যেতে পারে।

খ) পত্র-পত্রিকা ভিত্তিক সমর্থন

১। একটি অপরাধ সংক্রান্ত খবরে নিম্নোক্ত ব্যক্তি পরিচয়টি সংবাদপত্র সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে : রমলা মারাক, পিং নিতাই সাঙমা, সাং জোড়া আমগাছা, মধুপুর, টাঙ্গাইল। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, তাং ২৫-১২-৮৯)।

২। চাক রূপকথা টিয়া কাহিনীর নায়িকা, আলু সাঙমা। সূত্র : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী : গিরি নির্ঝর, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা মে ১৯৮২।

৩। বিখ্যাত গারো নেতা পি. এ. সাঙমা ভারতের সাবেক লোকসভার স্পীকার।

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, গারো ও চাকদের মাঝে সাঙমা পদবিটি প্রচলিত আছে। এ সামঞ্জস্য হলো চাঙমা বা সাঙমা নামের মৌলিকত্ব আর এই তিন সম্প্রদায়ের অভিন্ন মূল হওয়ার একটি সূত্র।

চম্পক নগরের অবস্থান নির্ণয় ও চাকমা দেশান্তর

এখন চাকমাদের মূল বাসস্থান চম্পক নগরের অবস্থান ও বাস্তবতা নির্ণয় করা আবশ্যক। লোক কাহিনীর বর্ণনানুযায়ী তা ব্রহ্মপুত্রের হিমালয় অংশ সাংপো বা ঐ পর্বতের পূর্ব-দক্ষিণ ঢালের ইরাবতী নদীর তীরবর্তী কোন অঞ্চল বা দেশ। কিন্তু তা প্রাচীনকালের ভেলা বা চালি বাহিত নদীপথের ছয় দিবারাত্রি দূরের সংযুক্ত বাংলা অঞ্চল নয়। সুতরাং করতোয়াকে সূত্র ধরে তার ছয় দিবা রাত্রি দূরের উজানে, হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে নেপাল সংলগ্ন অঞ্চলেই তার অবস্থান থাকা সম্ভব। যাত্রা পথে তেওয়া বাঘা ও ঘাঘট নদী পড়ায় মূল কাহিনীর দ্বারাই তার অবস্থান উত্তর ভারতীয় তরাই অঞ্চলে নির্ণিত হয়। এ ব্যাপারে অন্য সহায়ক সূত্রগুলো হলো, যথা :

ক) অভিযাত্রী দলের দলপতির গিরি উপাধি।

খ) চাকমা কটুবাক্য : মগধা।

গ) চম্পক নগরের নগর বিশেষণ।

ঘ) চাকমা ভাষার ভাওয়াইয়া ও হিন্দী চরিত্র।

ঙ) চাকমা রাজসূত্রের স্বীকৃতি।

চ) ঘটনা সূত্রে ব্যক্ত সামঞ্জস্যশীল নামের সমর্থন।

ক) উত্তর বিহার অঞ্চলকে গাড়োয়াল অঞ্চল বলা হয়ে থাকে। ওখানকার অনেক লোকের গিরি উপাধিযুক্ত নাম রাখার প্রবণতা আছে। আমরা বৃটিশ আমলের বিখ্যাত সন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাসে অনেক সন্যাসী গুরুর গিরি উপাধিযুক্ত নাম লক্ষ্য করে থাকি। সাধারণতঃ ওরা ছিলেন হিন্দী ভাষী উত্তর বিহারবাসী লোক। এই গিরি উপাধিসূত্রে বিজয় গিরির বাসস্থান চম্পক নগরের অবস্থান উত্তর বিহারের বাংলা সীমান্তের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব।

খ) চাকমারা কুপিত হলে, বিপক্ষের প্রতি মগধা বা মগধামু এই কটুবাক্যটি প্রয়োগ করে থাকে, যা মগধ নাম জাত বিশেষণ বলেই আমার ধারণা। অতীতে কখনো তাদের মগধবাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়া সম্ভব। যদ্দরুন মাঘধীরা তাদের কাছে ঘৃণিত মগধা। এটা চাকমা ভাষাজাত নিজস্ব কটু বিশেষণ। কেউ কেউ মগধাকে মৌতা শব্দের অপভ্রংশ মনে করে থাকেন, কিন্তু তা ভুল ও দুর্বল যুক্তি। এই সূত্রে বুঝা যায় মগধের অভ্যন্তরে বা কাছাকাছি হিমালয় ঢালেই কথিত চম্পক নগরের অবস্থান ছিলো।

গ) নগর বিশেষণপ্রবণ অঞ্চল হলো নেপাল বিহার ও বাংলাদেশ। দক্ষিণপূর্ব নেপালের বৈরাট নগর, বিহারের জমশেদ নগর, বাংলার নবীনগর ইত্যাদি তার প্রমাণ। সুতরাং এই সূত্রেও চম্পক নগরের অবস্থান এই তিন আঞ্চলিক ত্রিভুজের ভিতরই পড়ে।

ঘ) চাকমা ভাষা আঞ্চলিক বাংলা হলেও, ভাওয়াইয়া ও হিন্দীর দ্বারা প্রভাবিত, যথা

১। **চাকমা গান :** "রাজা বাদাত পান হেদুং।
গুরু সাধি নাং পেদুং।
সাধিঘরত আবুচতুং।
পর্বুয়া পন্দিত মুই হদুং।
দর্য্যা করলি পায় গন্দুং।
আকাচ চান তারা আদত পেদুং। *(সূত্র : গজেনোর লামা)*

বাংলা : রাজার বাটায় পান খেতাম!
গুরু সাধি নাম পেতাম!
সাধি ঘরে বসতে পেতাম!
দরিয়ার কাকড় পায়ে গুণ্‌তাম!
আকাশ চাঁদ তারা হাতে পেতাম!

২। **ভাওয়াইয়া গান :** হাত ধরং ওরে কালা পাও বা ধরং তোরে
ওরে গাছের কাপড় পাড়িয়া দে তুই যাং এলা ঘরে রে!

এখানে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে বিস্ময়কর মিল ব্যক্ত হয়েছে। এটা যেন চাকমা গান।

৩। **হিন্দী কথ্য রীতি ঃ** হাম যায়েংগে, এর চাকমা রূপান্তর হবে, আমি যেবোং গে। এখানে সর্বনামে ও বহুবচনে হাম এর পরিবর্তে আমি এবং যাওয়া ক্রিয়াপদে ংগের স্থলে ংগে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে হিন্দির মত চাকমাতেও ক্রিয়ার আগে না পদ বসে, যথা হিন্দি, নেহি যায়েঙ্গে, চাকমা ন যেবোংগে। শব্দ ও বাক্যে ব্যবধান সামান্যই লক্ষ্যণীয়। এতেও প্রমাণিত হয়, এই ত্রয়ী কথারীতির লোকেরা পরস্পরের এককালিন প্রতিবেশী হয়ে থাকবে।

ঙ) চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে প্রয়াত রাজা মাননীয় ভুবন মোহন রায় উল্লেখ করেছেন :

অনেক দিন পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্য নামে এক রাজা বাস করতেন, কলাপ নগর (কল্পনগর) তার রাজ্যের রাজধানী ছিলো। ---------- মন্ত্রী শ্যামল কলাপ নগর ত্যাগ করে হিমালয়ের দক্ষিণ পূর্ব ধারে একটা নূতন রাজ্যের পত্তন করেন। ------ চম্পা কলি নামে তার এক পুত্র ছিলো। তিনি ইরাবতী নদীর পূর্ব পারে একটা নতুন নগর গড়ে তুলেন। পুত্রের নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় চম্পক নগর।

এখানে চাকমাদের আদি বাসস্থান কলাপ বা কল্পনগর শাক্য অধ্যুষিত হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত বলে বর্ণিত হওয়ায় তা নেপালের দক্ষিণের তরাই অঞ্চলই নির্ণীত হয়। অপরদিকে চম্পক নগরটি উপরের পরিবেশগত বর্ণনায় ইরাবতী উপত্যকায় অবস্থিত বলে সমর্থিত হয় না।

যেহেতু ভাওয়াইয়ার জন্মস্থান উত্তর বাংলা এবং মাগধীও হিন্দির প্রচলন ক্ষেত্র, তার পশ্চিমাঞ্চল, এই দুই ভাষা শৈলীর সাথে মৌলিকভাবে সামঞ্জস্যশীল চাকমা ভাষারও জন্মক্ষেত্র ঐ পরিবেশেই হওয়া সম্ভব। সেহেতু চম্পক নগরের অবস্থান উত্তর বাংলা ও মগধ অঞ্চলের ধারে কাছে বা ভিতরেই হবে।

চ) ঘটনা সূত্রে ব্যক্ত সমর্থন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকেও পাওয়া যায়, যথা :

১। কামগার খান মুইন চম্পানগর নালায়, শিবির সন্নিবেশিত করেছিলেন। ---- অধুয়ায় নবাবের (মীর কাশেম আলী খাঁ) সৈন্যরা প্রায়ই রাত্রিকালে গুপ্তপথে বেরিয়ে এসে ইংরেজ সৈন্যদের বিপর্যস্ত করতো। সূত্র : রিয়াজুস সালাতিন পৃ: ৬০৯, বাংলা অনুবাদ)।

২। মীর হাবিব ও তার (মারাঠী) বন্ধুরা চম্পা নগরের নদীতে আলীবর্দী খাঁকে বাঁধা দিতে ব্যর্থ হয়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে। *(সূত্র : সিয়ারুল মোতায়াখ খিরিন থেকে উদ্ধৃতি ঐ পৃ: ৫৬৫)।*

উপরোক্ত সূত্রে বিহারের উদয় নালায় একটি চম্পানগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা উত্তর পূর্ব বিহারের পুর্ণিয়া জেলার নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। তারই সামান্য পরিবর্তিত রূপায়ন চম্পক নগর। সম্ভবতঃ ঐ অবস্থান থেকে মূল মাগধী শাসক গোষ্ঠীর উৎপীড়নের ফলে চাকমারা স্থান ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম দিনাজপুর বা নিম্ন দার্জিলিং অঞ্চলের দিকে আসে। মগধ রাজ্যাধীন অঞ্চলে না থাকার মনোভাবের ভিত্তিতে তারা আরো দূরে কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পার্শ্ববর্তী কোন এলাকাও তাদের মনঃপূত হয়নি। ফলে একটি ছড়া পথে নেমে এসে করতোয়া নদীতে পড়ে। তৎপর নীচের দিকে দীর্ঘ যাত্রার শুরু। সম্ভবতঃ নির্বিরোধ নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলই তাদের কাম্য ছিলো, যা জুম চাষ ও সংঘাত প্রতিযোগিতাহীন জীবন যাপনের উপযোগী। তাই ত্রিপুরায় ও তাদের স্থিতিলাভ ঘটেনি। আরো দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ের দিকে তারা ক্রমান্বয়ে সরে যেতে থাকে। গোমতি নদী তীরের চম্পক নগর ও ফেনী নদী তীরের চম্পক নগর পরিচিত স্থানগুলো হয়তো তাদের অন্তরবর্তীকালিন বাসস্থান ছিলো। নির্বিরোধ নির্জন পাহাড়াঞ্চলকেই বাসস্থান হিসাবে অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকায়, তারা চট্টগ্রামের বসতিপূর্ণ সমতল অঞ্চলকে এড়িয়ে ফেনী নদী হয়ে উজানের দিকে এগিয়ে থাকবে। তৎপর ঠেকানদী হয়ে চীন পাহাড় অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছে। পরে তারই দক্ষিণের পাহাড় ও উপত্যকা ভূমিকে কাঙ্খিত বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছে। ওটাই তাদের দীর্ঘদিনের বসবাস ক্ষেত্র কথিত মইসা গিরি রাজ্য, যা উত্তর আরাকানের রোসাং রাজ্যভুক্ত এলাকা।

হয়তো তাদের আধিপত্য আর অবাধ্যতায়, ঐ অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতার ভয়ে, মগ জনগণও রোসাং অধিপতি তাদের প্রতি রুষ্ট হোন, অথবা তারা সেখানে রাজকীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় বিদ্রোহ করেছিলো। যদ্দরুন আক্রান্ত আর বিতাড়িত হয়। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহগুলোর সাথে এটিকেও মিলিয়ে দেখলে অনুমিত হয়, ওটাও ছিলো ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। মাগধীদের দ্বারা আক্রান্ত আর বিতাড়িত হওয়ার কার্যকারণটিও অনুরূপ বিদ্রোহজনিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং বলা যায়, এ সম্প্রদায়টি মূল থেকেই চরিত্রগতভাবে বিদ্রোহপ্রবণ, স্বাধীনচেতা ও উচ্চাকাঙ্খী। চম্পকনগর হলো তাদের দীর্ঘ পোষিত স্বাধীনতা আকাংখার প্রতিকীভূমি। কাঙ্খিত ক্ষমতা কেন্দ্র হিসাবে এই নামটি তাদের অন্তরের গভীরে গ্রথিত হয়ে আছে। জুম্মল্যান্ডের ধূঁয়া ঐ চম্পক নগরেরই বাহ্যিক অবয়ব।

টুং টুঙ্গ্যা, টংটগ্যা ও তঞ্চঙ্গ্যা

টুং টুঙ্গ্যা হলো চাকমা সমাজের অন্যতম বৃহৎ একটি শাখা। এ নামটি শুনতে যেমন ঝংকারময়, তেমনি তার উচ্চারণটিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেউ বলেন চং চঙ্গ্যা, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা, তবে বাঙ্গালীদের কাছে তা প্রায় অভিন্নভাবেই টুং টুঙ্গ্যা বা টং টঙ্গ্যা। উপজাতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, আরাকানী ভাষায় টং মানে পাহাড়, এবং টঙ্গ্যা অপভ্রংশে জুমিয়া, যার পূরা অর্থ পাহাড়ী জুমিয়া। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য নয়। টং টঙ্গ্যা নামটি আরাকানে প্রচলিত নেই। সেখানে এ নামের কোন জনগোষ্ঠীর থাকার কথা কোন বিবরণেই ব্যক্ত হয়নি। সুতরাং টং পাহাড় অর্থ জ্ঞাপক আরাকানী শব্দ হলেও টং টঙ্গ্যা চট্টগ্রামী বাংলা শব্দ। নামটির অর্থবহ বাংলা সূত্র হলো টং অর্থ মাচা ঘর, টঙ্গ্যা অর্থ মাচা ঘরের বাসিন্দা। চট্টগ্রামী আঞ্চলিক ভাষায় শব্দের শেষে ইয়া উয়া উপসর্গ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য আর বিশেষণ গঠিত হয়। এই নিয়মে টং থেকে টঙ্গ্যা শব্দ গঠিত। এ নামের অপর সূত্র হলো : পূর্বাঞ্চলের আলী কদম থানাধীন তৈনছড়ি এলাকায় এককালে চাকমা উপজাতির ঘন বসতি ছিলো। তারা ছিলো সাধারণতঃ মাচাঘরে বসবাসে অভ্যস্ত। তাই নিম্নাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা তাদেরকে তৈন ছড়ার মাচাঘরবাসী অর্থেও প্রথমে তৈন টঙ্গ্যা নাম দিয়ে থাকবে। তৎপর তা থেকে দীর্ঘদিনে পরিবর্তিত হয়ে টং টঙ্গ্যা হয়েছে। টুং টুঙ্গ্যা নামের সাধারণে প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো, ঐ সমাজের বিশেষ শাখার মেয়েরা রূপার হাসুলী, খাড় বাজুবন্দ ও টাকার লহর অলংকার হিসাবে পরে থাকে, যা চলাফেরা ও নড়াচড়াকালে টুংটাং ঝংকার তুলে। ঐ টুং টাং শব্দের সাথে চট্টগ্রামী ইয়া উয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে টুং টাংকারী অর্থে টুং টুঙ্গ্যা নামের উদ্ভব হয়েছে। আরেক ব্যাখ্যা হলো, তারা গৃহপালিত পশুগুলোকে গলায় বাঁশ বা কাঠের খোদাইকৃত ঘন্টি পরিয়ে জঙ্গলে চরতে দেয়, যার টুং টাং আওয়াজে পশুগুলোর অবস্থান নির্ণীত হয়। এই সূত্রেও তারা টুং টুঙ্গ্যা।

সেক, থেক, চাঙমা ও সাঙমা

স্যার আর্থার পি ফেইর স্বীয় পুস্তক History of Burma তে উল্লেখ করেছেন : আরাকানে Thek অথবা Sak নামীয় একটি সম্প্রদায় আছে। আধুনিক চাকমা পন্ডিত বাবু সুগত তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : আরাকানী ও বর্মীরা চাকমাদেরকে Sak বা Thek বলে। (সূত্র : মোন কথা : চাকমাদের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস, পৃ: ২৩/১৯৯১)।

এখানে আর্থার পি ফেইর এর গোটা বক্তব্যটি দ্রষ্টব্যঃ

"When Meng Beng was thus engaged, an enemy had appeared from the north, called in Arakanese history the thek or sak king, by which Raja of Tippera appears to be meant, He had penetrated to Ramu, but was now driven back, and Meng Beng again occupied Chittagong. *(Ref : The History of Burma, page 79/1883)*

বাংলা : মেং বেং অন্যত্র ব্যস্ত থাকাকালে উত্তর থেকে আগত জনৈক শত্রুর আবির্ভাব ঘটে, যিনি আরাকানী ইতিহাসে থেক বা সেক রাজা নামে অভিহিত হোন, যে নামের দ্বারা ত্রিপুরা রাজাকে বুঝান হয়ে থাকে। তিনি রামু পর্যন্ত অগ্রসর হোন, তবে তাকে হটিয়ে, দেয়া হয়। এবং মেং বেং পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করেন।

(সূত্র : হিষ্টোরী অফ বার্মা পৃ: ৭৯/১৮৮৩)

উল্লেখ্য যে সেক এর উচ্চারণে আমি সুগত বাবু ও অন্যান্য স্থানীয় লেখকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। আসলে তা সাক বা চাক নয়, সেক। প্রতিশব্দ থেক এর উচ্চারণের সাথে সেকই সামঞ্জস্যপূর্ণ, সাক বা চাক নয়। শব্দ দুটির মূল শব্দ হলোঃ আরবী শেখ, যার প্রথম অক্ষর একারে উচ্চারিত হয়, আকারে নয়। ইংলিশ উচ্চারণ রীতিতেও তিন অক্ষর যুক্ত শব্দের মধ্যবর্তী, A সচরাচর একারেই উচ্চারিত হয়। মধ্যবর্তী বর্ণ U হলে আকারের প্রয়োগ ঘটে। সুতরাং সাক বা চাক উচ্চারণ ভুল।

থেক বা সেক যে আরবী শেখ শব্দের অপভ্রংশ, তার সাথে মাননীয় আর্থার ফেইরও একমত, যথা : তখন এতদাঞ্চলে (আরাকানে) কিছু পশ্চিমা লোক বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন, যাদের অনেকের উপাধি ছিলো শেখ, যা থেকে থেক বা সেক নামের উৎপত্তি হয়েছে। সূত্র : জার্নাল ওফ এশিয়াটিক সোসাইটি ওফ বেঙ্গল, সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪ পৃ: ২০১-২। আমার জানা মতে, আরাকানী ভাষায় এস এইচ বা শ বর্ণটি হালকা উচ্চারণে টি এইচ বা এস এর আকারে থ বা স হয়ে দাঁড়ায়। কে এইচ বা খ হয়ে পড়ে কে বা ক। একারণে মূল আরবী শব্দ শেখ বা Shekh রূপান্তরিত হয়ে সেক হয়েছে।

নদী সীমা পর্যন্ত, অবশিষ্ট দক্ষিণাঞ্চল বিজিত হয় এবং তথাকার জুমচাষযোগ্য এলাকাগুলোকেও তুলা মহালভুক্ত করে রাজস্ব প্রশাসন সম্প্রসারিত হয়।

জুমবঙ্গের অধীন উত্তরাঞ্চলের জুমিয়ারা কোন সর্দারের নিয়ন্ত্রণে মোগল সরকারের সাথে সম্পর্কিত ছিলো না। তারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রাজস্ব কর্মচারীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতো। পরে দক্ষিণাঞ্চলে এর কিছু ব্যতিক্রম সূচিত হয়। ১৭১১ সালে রোসাং অণুগত জনৈক উপজাতীয় সর্দার, স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু লোকজন সহ মাতামুহুরী উজানের তৈনছড়ি এলাকায় এসে বসতি গড়েন। তিনি চন্দন খান ওরফে তৈন খান নামে পরিচিত হোন। পরবর্তী বছর তার মৃত্যু হলে ছেলে রতন খান সর্দার হোন। তিনিও বছরান্তে মারা গেলে তৎপুত্র কুত্তুয়া সর্দার হোন। তিনিও বছরের ভিতর তিরোহিত হলে তৎপুত্র জালাল খান ১৭১৪ সালে সদারী লাভ করেন। এই তিন বছরের ভিতর মোগল দখলাধীন অঞ্চলের দুর্গম সীমান্তে বর্ণিত বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ও জবরদখলে মোগল প্রশাসন তাদের উচ্ছেদে সক্রিয় হয়। তাতে আক্রমণ ও চাপের মুখে জালাল খান, মোগল আনুগত্য স্বীকায় ও করদানে অঙ্গিকারাবদ্ধ হোন। ১৭২৪ সালে তিনি করদানে বিরত হলে দোহাজারীতে অবস্থানরত মোগল ফৌজদার কিষণ চাঁদ কর্তৃক আক্রান্ত হোন। ফলে জালাল খাঁ পক্ষীয়দের উচ্ছেদ ও আরাকানে বিতাড়ন ঘটে। অবসান হয় চন্দন খাঁ বংশীয়দের ১৩ বছর দীর্ঘ ক্ষুদ্র সীমান্ত অঞ্চল তৈনছড়ির জবর দখলের।

চাকমা ইতিহাসকাররা দাবী করেন, ঐ জালাল খাঁ ছিলেন অন্যতম স্বাধীন চাকমা রাজা এবং স্বাধীন রাজা হিসাবেই স্বীয় প্রজাদের সাথে মোগল অঞ্চলবাসীদের কাজ কারবারের অনুমতি লাভে, মোগল সরকারকে ১১ মণ তুলা কর দানে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় একটি প্রতিবেদনেও নিম্নোক্ত বক্তব্যটি আছে। যথা ঃ

"They were all indepently paid no tribute or revenue to the Moghal government untill the moghee year 1077 ms 1715 AD'' (Ref : Revenue letter no 1499 Dated 10th September 1866)

বাংলা ঃ তাদের কেউ স্বেচ্ছায় ১০৭৭ মঘী বা ১৭১৫ খ্রীঃ সালের আগে মোগল সরকারকে কোনরূপ উপঢৌকন বা কর দিতেন না। (সূত্র ঃ রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬)

এই প্রতিবেদনভুক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, তখন সর্দার জালাল খাঁ মাত্র ক্ষুদ্র সীমান্তভূমি তৈনছড়িতে মোগল আনুগত্যে করদানের সূচনা করেন। তার পূর্ববর্তী সময়ে এই বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলের অপর কোথাও কোন ভিন্ন এক বা একাধিক

উপজাতীয় সর্দার বা জনগোষ্ঠীর কোনরূপ অবস্থান বা নিয়ন্ত্রণ থাকার কোন সঠিক বিবরণ প্রাপ্তব্য নয়। গোটা এলাকাই ছিলো জনবিরল বনাঞ্চল। সুতরাং এ বলা ও ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, তখন সার্বিক ভাবে এতদাঞ্চল ছিলো উপজাতি অধ্যুষিত ও নিয়ন্ত্রিত। আজকের উপজাতিদের অধিকাংশ বৃটিশ আমলের বহিরাগত, তথা বার্মাতাড়িত অভিবাসী। চন্দন খাঁনের সাথে তাদের একজাতি একগোত্রভুক্ত হওয়াও প্রমাণহীন দাবী। তদুপরি তারা ইতিহাসের দৃষ্টিতে বহিরাগত ও বিতাড়িত। তারা এদেশের ভূমিজ সন্তান নয়।

প্রাচীনকালের রাজ্য বিস্তার সুত্রে কিছু আরাকানী মগ ও ত্রিপুরাদের এতদাঞ্চলে আগমন ও বসবাস গ্রহণ সম্ভব বলে স্বীকার্য্য। তবে পরবর্তীকালের পরাজয় ও বিতাড়ণে তাদের অধিকাংশের স্বদেশে প্রত্যাগমন ও ঘটেছে। ঐ স্বল্পসংখ্যক অভিবাসীদের মাঝে চাকমাসহ অন্যান্য উপজাতি ছিলো, এমন কোন প্রমাণ নেই। কেবল বৃটিশ আমলভুক্ত বহিরাগমন তালিকায় চাকমা ও অন্যান্যদের নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং মগ ও ত্রিপুরা বাদে অপর কোন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীন অধিবাসী হওয়ার দাবী আজগুবী।

চাকমা আদিবাস প্রমাণের পক্ষে কেউ কেউ পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়া ও ডে বারোজের চট্টগ্রাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ১৫৫০ সালে অঙ্কিত একটি মানচিত্র প্রদর্শন করে থাকেন, যেটিতে একটি চাকমা অঞ্চল প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু আসলে ঐ অঞ্চলটি, বার্মা বা উত্তর আরাকানে অবস্থিত বিদেশভূমি। বর্ণিত মানচিত্রটি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, কর্ণফুলীর দু'টি প্রধান উপনদী, চিহ্নিত চাকমা অঞ্চলের পশ্চিম থেকে উৎসারিত হয়ে ধনুক আকৃতিতে উত্তর পশ্চিমে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মধ্যাঞ্চলে মিলিত হয়েছে। চাকমা অঞ্চলটির উত্তর পশ্চিমে ত্রিপুরা, দক্ষিণ পশ্চিমে আরাকান এবং সংলগ্ন পূর্বাঞ্চল হলো বার্মা নামে চিহ্নিত এবং লোভাস দোকাম বা আলী কদম নামীয় এলাকাটি তার খানেক দূরে সামান্য দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ঐ জায়গাগুলোর প্রকৃত অবস্থানের আধুনিক বর্ণনায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, প্রদর্শিত উপনদী দুটি হলো রাইংক্ষ্যং ও সুবলং। সেগুলো সীমান্তবর্তী চীন পাহাড় থেকে উৎপন্ন এবং পশ্চিম ঢালের উত্তর পশ্চিমমুখী খাদ ও উপত্যকা হয়ে প্রবাহিত। চীন পাহাড় মূলতঃ উত্তর আরাকান জুড়ে বিস্তৃত। তার উত্তরে লুসাই ও দক্ষিণে ইয়োমা পর্বত। চীন পাহাড়ের অন্যতম দক্ষিণমূখী নদীহলো কালাদন। এই পাহাড় শ্রেণীর উত্তর মাথা থেকে ঠেকা নদী ও দক্ষিণ মাথা থেকে নাফ নদী প্রবাহিত। এ নদী তিনটি হলো বাংলাদেশ, আরাকান ও মিজোরামের মধ্যবর্তী সীমারেখা। বাস্তবে বাংলাদেশ মুখী নদীগুলোর পূর্বাঞ্চল হলো বার্মা। একমাত্র কর্ণফুলী নদীটাই মিজোরামের প্রায় চল্লিশ মাইল ভিতর প্রবিষ্ট। এছাড়া এতদাঞ্চলীয় প্রতিটি নদী উপনদীর উৎসস্থল হলো চীনপর্বত ও ইয়োমা সীমান্ত। এই নদী উৎসের পূর্বে অবস্থিত চাকমা অঞ্চলটি উত্তর আরাকানেই পড়ে। বাস্তবে বৃহত্তর আরাকান হলো দক্ষিণে,আলী কদম পশ্চিমে, বার্মা পূর্বে ও ত্রিপুরা উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। খোদ

চাকমাদেরও দাবী হলো ঃ উত্তর আরাকানে মৎস্য গিরি বা মনিজা গিরি নামীয় তাদের একটি রাজ্য ছিলো। মগ উৎপাতে সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে। ঠেকা নদীর নামটি থেকা নামের বিকৃতি ভাবা হলে, মনে করা যায়, সেক ও চাক নাম দুটি থেকে থেক নাম অপভ্রংশ, যাদেরকে চাকমাদের বিচ্ছিন্ন গোত্র বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন অভিযাত্রী চাকমারা ঠেকা নদীকে তাদের যাত্রাপথ করে আরাকানে পৌছে থাকবে। ত্রিপুরা থেকে আরাকান যাত্রার এটা ছিলো নিরাপদ পথ। আরাকানীদের কাছে চাকমারা থেক নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এই থেক জনগোষ্ঠীবাহী নদীটির নাম তাদের দ্বারাই থেকা বা ঠেকা রূপে নির্ণিত হয়েছে। এই ঠেকার উৎস অঞ্চলের খানেক দক্ষিণে হলো কালাদন নদী উপত্যকা। আরাকানী ভাষায় কালা মানে বাঙালী। এটাও চাকমা নামের বিকল্প। কারণ চাকমা নাম ও ভাষা বাংলারই অনুরূপ। সুতরাং সাধারণ মগদের কাছে তাদের বাহ্য পরিচয় বাঙালী, অর্থাৎ কালারূপেই ঘটেছে।

এই শ্রুতি-তথ্যের আলোকেও বলা যায় ঃ কালাদন উপত্যকায়ই ছিলো বহুল কথিত চাকমাভূমি মৎস্য গিরি বা মনিজা গিরির অবস্থান। জোয়াও ডে বারোজের চিহ্নিত চাকমা অঞ্চলটি ঐ কালাদন উপত্যকা বলেই ধরে নেয়া যায়। বাস্তবেও তার অবস্থান হলো আলীকদম পূর্ব সীমান্তের বাহিরে। চাকমারা যে আরাকান ত্যাগী অভিবাসী তার অকাট্য প্রমাণ হলো : শের জব্বার খানের সীলমোহরে উল্লেখিত রোসাং ও আরাকানের বর্ণনা, লোকগীতিতে মগদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচারে, স্বদেশ চম্পক নগরে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রার উল্লেখ, আদি রাজা শের মস্ত খানের রোসাংবাসী হওয়ার স্বীকৃতি, খেমার বর্ণের চর্চা, মঘী নাম খেতাব ধারণ, আরাকানী ইতিহাসে মইসাগিরি অঞ্চল থেকে চাকমা উৎখাতের বর্ণনা, আরাকানী রাজা ও বর্মী সম্রাট কর্তৃক চট্টগ্রামের বৃটিশ শাসককে লিখিত চিঠিপত্রে চাকমা লোকদের উল্লেখ, বর্মী ও আরাকানী শরণার্থী সংক্রান্ত উভয় সরকারের কূটনৈতিক পত্রালাপে চাকমা সংক্রান্ত বিবরণ ও রাজা ভুবন মোহন রায়ের লিখিত এ দাবী যে, বার্মায় একটি চাকমা রাজ্য ছিলো।

অকাট্য দলিলপত্রের দ্বারা এ প্রশ্নটিও মীমাংসিত যে, কখন থেকে চাকমাসহ উপজাতীয় বহিরাগত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশবাসী। ইতোমধ্যে এটি আলোচিত হয়েছে যে, দখল ও দিগ্বিজয় উপলক্ষে প্রতিবেশী ত্রিপুরা ও রোসাংবাসীদের কিছু লোকের মোগল পূর্বকালে এতদাঞ্চলে বসবাস গ্রহণ সম্ভব। যাদের অধিকাংশের পক্ষে পরবর্তীকালের মোগল শক্তির জয় ও বিতাড়নে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করাটাও, অসম্ভব নয়। যেহেতু পর্বত্য ও বনময় পূর্বাঞ্চল তখনো ছিলো অনাবাদী ও দুর্গম এবং পশ্চিমের আবাদী সমতল ও ঘনবসতিপুর্ণ ছিলো না, সেহেতু ধরে নেওয়া যায়, মোগল আমলে কিছু বহিরাগত ত্রিপুরা ও মগ টিকে থাকলেও তাদের অবস্তান ছিলো নদী উপত্যকায় সিমাবদ্ধ। ঐ তাদেরই বংশধরেরা এখনো ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু আকারে চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে টিকে আছে। বাঙালীদের সাথে সংমিশ্রণের মাধ্যমে

তাদের অনেকের বিবর্তন ও ঘটে গেছে। বড়ুযারা এরূপ একটি সম্প্রদায়। আসলে তারা মগ ও হিন্দু বাঙালীদের সংকর। চট্টগ্রামের মুসলিম জেরবাদীরাও তাই।

বিপুল সংখ্যায় আরাকানী শরণার্থীদের আগমনকাল হলো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকালের বৃটিশ আমল, যখন আরাকানে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ চলছিলো এবং প্রতিদ্বন্দ্বী এক দলের দ্বারা, বর্মী আভারাজা, বোদাপায়া আমন্ত্রিত হয়ে গোটা আরাকান দখল করে নিয়েছিলেন এবং নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ব্যাপক দমন পীড়ন চালিয়েছিলেন। তাতেই বাংলার দিকে ভীত উৎপীড়িত আরাকানীদের ঢল, ছুটে। এই শরণার্থী স্রোত ১৭৮৪ থেকে ১৮২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাতে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আরাকানী পাড়ি জমায় বাংলাদেশে। ঐ শরণার্থী দলেরই লোক হলো আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী চাকমা, মারমা ও অন্যান্য উপজাতিদের পূর্বপুরুষরা। ১৮২৪ সালের বার্মা-বৃটিশ যুদ্ধ আর বৃটিশ কর্তৃক আরাকান দখল ও তার ভারতের অন্যতম প্রদেশরূপে সংযুক্তি হলো ঐ শরণার্থী তিক্ততারই ফল। ঐ বিজয় ও সংযুক্তির কারণে বৃটিশ ভারত হয়ে যায় আরাকানী শরণার্থীদের প্রায় স্বদেশ। তারা বিদেশী রূপে গণ্য ছিলো না। তাদের ধরে রাখার প্রতি বৃটিশদের ঔপনিবেশিক ও ধর্মীয় স্বার্থ ও ছিলো প্রবল। তাই ঐ শরণার্থীরা স্বদেশ ফিরৎ যায়নি, এদেশেই স্থায়ী হয়ে যায়।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মগ ও ত্রিপুরা ছাড়া মোগল আমলের শেষদিকে আরাকানী বংশোদ্ভুত চন্দন খাঁ বংশ ও তাদের অধীন কিছু লোক মাতামুহুরী নদী উজানের তৈনছড়িতে ১৩ বছরকাল মাত্র বসবাস করেছিলেন। তাদের শ্রেণী ও গোত্রগত পরিচয় অজ্ঞাত। তৎপর আরো ১৩ বছরের মাথায় শের মস্ত খাঁন নামীয় জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একদল চাকমার আরাকান ত্যাগ ও চট্টগ্রামে আশ্রয় লাভ ঘটে। ঐ আদি বসতকারী চাকমারা পরবর্তীকালীন শরণার্থী চাকমাদের মাঝে নিজেদের সংখ্যাল্পতার কারণেই হারিয়ে গেছেন। তাদের আদি পুনর্বাসনক্ষেত্র রাঙ্গুনিয়াও এখন চাকমামুক্ত। কুকি ও লুসাই উৎপাত দমনের পর উর্বর ও নিরুপদ্রব পূর্বাঞ্চলেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় উৎসাহে তারা অধ্যুষিত হয়। জনবিরল পাহাড় ও বনাঞ্চল হলো উর্বর জুমক্ষেত্র যা বাঙালী বিরলও বটে। এই সুযোগে জুমজীবী শরণার্থী উপজাতিরা নিজেদের সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করে। দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মগ সম্প্রদায় এবং মধ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলে চাকমা সম্প্রদায় আধিপত্য বিস্তার করে নেয়। চট্টগ্রামের বাঙালীরা নিজেদের সমতলে গুটিয়ে রাখে এবং উপজাতিদের সাথে কাজ কারবার ও লেনদেনেই মাত্র নিজেদের সম্পৃক্ত করে। এই হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস। তাদের রাজা উজির হওয়া বাস্তব কিছু নয়। সম্বোধিত হওয়ার একটানা প্রক্রিয়াতেই রাজা হয়ে তারা এ নামের সীলমোহরও এখন বিনা বাধায় ব্যবহার করেন। অথচ উল্লেখ্য যে প্রাচীন সীলমোহরগুলোর একটিতেও রাজা উপাধির উল্লেখ নেই। সুতরাং রাজা উপাধিটি সন্তুষ্টিমূলক ও প্রাধান্য জ্ঞাপক স্বআরোপিত।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রাচীন বর্ণনায় কুকি, লুসাই ও সেন্দুদের উৎপাতের কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং তাদের গণ্য করা হয়েছে বহিরাঞ্চলীয় মুক্তাঞ্চলবাসী বলে। সুতরাং আমরাও তাদের এতদাঞ্চলের আদিবাসিন্দা বলবো না। অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতিদেরও কেউ এতদাঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়। আদিকালের জুমজীবী তুলাচাষী অবাঙালীরা, নিজেদের মুক্তাঞ্চল থেকে সীমান্ত পেরিয়ে কেবল জুম মওসুমে কিছুদিনের জন্য এসে জুম চাষাবাদে লিপ্ত হতো। ফসল তোলা শেষে তারা ফিরৎ যেতো নিজেদের মূল অবস্থানে। অঞ্চলগত কারণে পাহাড় সমতল নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের আদিবাসিন্দা হলো চট্টগ্রামী বাঙালীরা। পাহাড় ও বন বসতিহীন থাকলেও সে সব চট্টগ্রামের আওতাধীন সম্পদ। অন্যরা উড়ে এসে জুড়ে বসলেও চট্টগ্রামীদের এই আদিবাসীন্দার মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। বিপরীতে কোন অবাঙালী লোকই বসবাসসুত্রে এতদাঞ্চলের আদিবাসীন্দা নয়। তারা বহিরাগত অভিবাসী। তাত্বিক অর্থেও তাদের আদিবাসী হওয়া নিশ্চিত নয়। কারণ তাদের মাঝে প্রাচীন কৌম শ্রেণীভুক্ত লোকের কোন স্বভাব চরিত্র নেই। আচার-আচারণ ও গুণাবলীতে তারা সুসভ্য আধুনিক ও অগ্রসর মানুষ। রং ও গঠনে পৃথক হলেও সভ্যতা গুণে তারা বাঙালীদের সমান মান সম্পন্ন। সুতরাং প্রাচীন পশ্চাদপদ অর্থে তাদের উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী বলা যথার্থ নয়। কেবল সংখ্যালঘু অর্থে এ সংজ্ঞাগুলোর ব্যবহার করা যায়।

আসলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী আদিতে একেকজন নিজস্ব দলপতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রূপেই। দলপতি নিয়ন্ত্রিত হয়েই তাদের আগমন ও বসবাস। এহেতু সরকারী কর্তপক্ষ ঐ দলপতিদের সাথেই যোগাযোগ স্থাপন করেন। স্বভাব ও অভ্যাস বশতঃ উপজাতীয় সাধারণ লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস ও ভ্রাম্যমান জুমচাষে অভ্যস্ত। এহেতু তারা দুর্গম পাহাড় বনের গহীনে ধরা ছোয়ার বাহিরে অবস্থান করতো। এই জটিলতার সমাধান হিসাবে দলপতি প্রথাকেই প্রশাসনের পক্ষে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। প্রথা অনুযায়ী প্রধান দলপতি হলেন গোত্রীয় সর্দার যিনি রাজা নামে খ্যাত হোন। তার অধীন নিম্নবর্তী সর্দার হলেন দেওয়ান, বা রোয়াজা তৎপর করবারী বা পাড়া প্রধান। হেডম্যান পদ উপজাতীয় প্রথাসিদ্ধ নয়, এ হলো বৃটিশ প্রবর্তিত মৌজা প্রধানের রাজস্ব পদবি। রাজার স্থলে চীফ পদবিটাও বৃটিশ প্রবর্তিত। খিসা হলো মধ্যবর্তী আরেক অভিজাত পদবি। এই চাকমা প্রথার বাহিরে মগ বা মারমাদের প্রচলিত প্রথা-পদবি হলো ঃ দুই গোত্রের দুই রাজপদ বোমাং ও মাং। তাদের অধীন উপগোত্রীয় প্রধান হলেন রোয়াজা। চাকেরা নিজেদের গোত্রীয় প্রধানকে বলে আহুন। প্রশাসনিক যোগাযোগ সুবিধার পক্ষে উপযোগী বলে সরকার এই প্রথা পদবী মেনে নেন। পরে ১৯০০ সালের রেগুলেশন নং ১ এর আওতায় রচিত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইনে চীফ, হেডম্যান ও কাবারী পদ আইনী অনুমোদন লাভ করে। চীফদের অধীন গোত্রদের আবাসভিত্তিক এলাকাগুলোকে চাকমা, বোমাং ও মাং সার্কেলভুক্ত করে তিনটি অপ্রশাসনিক উপজাতীয় বিভাগে বিভক্ত করা হয়। চতুর্থ সার্কেল হলো : নেপালী অভিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট মাইনী উপত্যকা এবং

পঞ্চম সার্কেল : সংযুক্ত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল। (যথা : ধারা নং ৩৫ হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল)

চীফদের দায়িত্ব হলো ঃ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা প্রশাসককে সাহায্য করা, জুম খাজনা উশোল, তত্ত্বাবধান ও সরবরাহ করা, জেলা প্রশাসকের আদেশ প্রত্যন্ত অঞ্চল ও জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়া এবং হেডম্যানদের দায়িত্ব হলো জুম কর সংগ্রহ আর স্বীয় মৌজাধীন গ্রামাঞ্চলের কোনরূপ পরিবর্তন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিরূপতাকে জেলা প্রশাসকের গোচরিভূত করা। সর্বোপরি প্রাকৃতিক সম্পদাদি রক্ষাও এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত (যথা : ধারা নং ৩৮ ও ৪১ (ক) এখানে উল্লেখ্য যে, চীফেরা কেবল সার্কেল প্রধানই নন, প্রত্যেক সদর মৌজারও হেডম্যান, তাই তাদের দায়িত্ব হলো দ্বৈত।

বিধি মতে পার্বত্য ভূমি প্রশাসন চীফ ও হেডম্যানদের অধীন ন্যস্ত এবং তারা কার্যতঃ সমূদয় খাস বন ও জমির তত্ত্বাবধায়ক। ধারা নং ৫০ অনুযায়ী ঃ প্রত্যেক পাহাড়ী লোক শহর বহির্ভুত অঞ্চলে, স্বীয় বাড়ি-ঘরের জন্য হেডম্যানের অনুমতিতে ও জেলা প্রশাসকের বন্দোবস্তি আদেশ ছাড়াই, ৩০ শতক খাস জমি দখলের অধিকার রাখে। এই আইনী ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান সহ জমি বন্দোবস্তি হস্তান্তর এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও চালানে স্থানীয় হেডম্যানের রিপোর্ট ও সুপারিশ আহ্বান, একটি সরকারী রীতি। এ সবের কারণে সমূদয় পার্বত্য ভূমি উপজাতীয় অধিকারভুক্ত বলে জ্ঞান করা হয়। বর্তমানে বনায়নের সরকারী উদ্যোগ, এ কারণেই উপজাতীয় বাধার সম্মুখীন। এই রীতি প্রথা ও আইনী ব্যবস্থাই উপজাতীয় দখলাধিকার যুক্তির ভিত্তি। আসলে এগুলো ঔপনিবেশিক ও পরাধীন আমলের জঞ্জাল। সারাদেশের মত এখানেও তহসিল ব্যবস্থার প্রবর্তনই সমাধান। মালিকানাহীন জমিদারী ও রাজ্যহীন রাজত্ব প্রথাই পার্বত্য চট্টগ্রামকে জটিল আবর্তে ফেলে রেখেছে।

বিদ্রোহ আর শান্তিচুক্তির বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিরা এখন জগদ্বিখ্যাত। তবে তাদের পরিচিতি ও ইতিহাস সে তুলনায় তত পরিজ্ঞাত নয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশে-বিদেশে তাদের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। তবে সঠিক পরিচিতি মূলক বই পুস্তকের অভাব আছে। প্রচলিত কিছু বই-পুস্তক ও স্মৃতিকথায় গল্প ও রূপকথার প্রাধান্যই বেশি। পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও নীতি নির্ধারণে এখন পর্যন্ত তা-ই বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে গল্প ও রূপকথার সুক্ষ্ম আড়ালে কিছু সত্য তথ্য অবহেলিত পড়ে আছে, যা ঐতিহাসিক কথা কাহিনীর মুলাধার। আরব্ধ আলোচনায় আমি তারই কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

উপজাতি অর্থে বুঝায় স্থানীয় অবাঙালী শাখা জাতিগুলোকেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এদের সবাই আদতে কৌম জনগোষ্ঠীভুক্ত প্রাচীন জাতিসত্ত্বা, বা তাত্ত্বিক অর্থে সংজ্ঞায়িত উপজাতি। এ ব্যাপারে পণ্ডিত মহলে সন্দেহ বিতর্ক প্রচুর। আমি নিজেও এ ব্যাপারে সন্দিহান। তাই আমার উল্লেখিত উপজাতি সংজ্ঞার অর্থ ঃ অবাঙালী

বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী। এদের মাঝে যারা আদি পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী, তারাই আমার কাছে পার্বত্য উপজাতি।

স্থানীয় আইনের সংজ্ঞায় প্রধান জনসমষ্টি ট্রাইব বা উপজাতিরাই স্থানীয় মুখ্য বাসিন্দা হিসাবে মান্য, তাই তাদের আলোচনা অগ্রগণ্য হয়েছে। তবে বাঙালীসহ অন্য জাতের অধিবাসীও এখানে থাকায়, তাদের আলোচনা দ্বিতীয় বা বিপরীত পর্যায়ে ঘটেছে। তাতেই তারা নন্ট্রাইব বা অউপজাতি রূপে সমষ্টিগতভাবে সংজ্ঞায়িত। অতীতে উপজাতি সংজ্ঞায়িত লোকেরাই ছিলো প্রধান স্থানীয় জনগোষ্ঠী। সংখ্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রাধান্যে তারা ছিলো সর্বাগ্রগণ্য। তাদের বিপরীতে বাঙালী ও অন্যান্যরা ছিলো সংখ্যা ও শক্তিতে নগণ্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের পরবর্তীতে উভয়ের শক্তি সামর্থে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বাঙালীদের পরিসংখ্যান উঠে গেছে সর্বোচ্চে। তারা জাতীয় জনসংখ্যার ৯৯% স্থানীয় ভাবে ৫০%এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও মালিক। এখন তাই স্বাধীন শাসক জাতির অহমিকা, পার্বত্য বাঙালীদেরও স্পর্শ করেছে। ফলে তারা উপজাতীয় আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা ক্ষুদ্র বিপরীতার্থে অউপজাতি রূপে উল্লেখিত হওয়াকে মানসম্পন্ন মনে করে না। ভাবে ঃ সংখ্যা ও শক্তিতে বাঙালীরাই বর্তমানে প্রধান জনগোষ্ঠী। পরিসংখ্যানে এককভাবে তারা স্থানীয় জনসংখ্যার অর্ধেক এবং অবাঙালীদের যৌগিক পরিসংখ্যান বাকি অর্ধেক। সুতরাং প্রধান ও শাসক জনগোষ্ঠী বাঙালীদের বিপরীতে, স্থানীয় সংখ্যলঘুদের সমষ্টিগত ভাবে অবাঙালী রূপে আখ্যায়িত হওয়াই যথার্থ।

উপজাতি রূপে আখ্যায়িত অবাঙালী স্থানীয় সংখ্যালঘুরা বর্তমান আইনে ১২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তবে আরো কিছু অবাঙালী সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, যারা না উপজাতি, না অউপজাতি, এই উহ্য জনগোষ্ঠীতে আবদ্ধ। সরকারই উপজাতিদের তালিকা মোট ১২টি সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ করে, স্থানীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন ও জারি করেছেন। বিপরীতে ঐ আইনে অউপজাতিভুক্ত করে উপজাতি বহির্ভূত অবাঙালীদের কোন তালিকা প্রদান করা হয়নি। বরং এককভাবে বাঙালীদেরই অউপজাতির মর্যাদায়, স্থানীয় পরিষদের প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়েছে। তবে আইনে উহ্য ও বর্ণিত উভয় গোষ্ঠীভুক্ত অবাঙালীদেরই আমি ইতিহাস আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমার মুখ্য আলোচনা, প্রধান তিন সম্প্রদায়, যথা ঃ চাকমা, মগ বা মারমা ও ত্রিপুরাদের নিয়েই পরিচালিত।

ইতিহাস বর্ণনার আগে ধারণা ও সংজ্ঞাগত পরিচিতির ব্যাপারটি পরিষ্কার করা দরকার। প্রায় বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় কোনরূপ পার্থক্য না করে, বর্ণিত অবাঙালী জনগোষ্ঠীকে একাধারে উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী আখ্যায় ভূষিত করা হয়। পণ্ডিতমহলের পক্ষ থেকেও, এর ব্যাখ্যা ও সংশোধনে আমার জানা মতে, কোন বক্তব্য নজরে পড়েনি। অথচ এটা একটি বিভ্রান্তি। আমার ধারণা ঃ তাত্ত্বিকভাবে এ সংজ্ঞাগুলো একার্থবোধক নয় আর শাব্দিক অর্থেও ভিন্ন। সাধারণ

পাঠক ও বোদ্ধারা তত্ত্ববাদী নন। তারা সোজা শাব্দিক অর্থই বুঝেন। সুতরাং একই ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর পক্ষে, একাধারে উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী হওয়া, তাদের কাছে বিভ্রান্তিকর। পণ্ডিতরাও তত্ত্ব আর শব্দগত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত নন।

হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল, আর পার্বত্য পরিষদ আইন, উপজাতি নামে, ১২/১৩টি অবাঙালী জনগোষ্ঠীকে, বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও অগ্রাধিকার মঞ্জুর করেছে। তাতে আদিবাসী সংজ্ঞা অনুপস্থিত। অথচ বৈশ্বিক স্বীকৃতির সুত্র হলো আদিবাসী হওয়া। জাতিসংঘ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে পশ্চাদপদ ঘোষণা করেছে। এই সুত্রেই তারা বিশেষ বিবেচনা ও পৃষ্ঠপোষণের দাবীদার। তদ্বারা উপজাতি চিহ্নিতরা উৎসাহিত। ফলে আদিবাসী ঘোষিত হওয়ার প্রতি সম্প্রতি তারা আগ্রহী। ১৯৯৪ সালকে বিশ্ব আদিবাসী বর্ষরূপে তারা পালন করছে, এবং তৎপ্রতি তাদের আগ্রহের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তাতে বুঝা যায়, এই লোকেরা নিজেদের আদিবাসী হওয়ার প্রতি আগ্রহী, তবে সরকার তাদের মনে করেন উপজাতি। চুক্তিতেও উপজাতি সংজ্ঞা গৃহীত।

তাত্ত্বিক অর্থে উপজাতি, ও পাহাড়ী মানে প্রাচীন গোত্র বা কৌম ভুক্ত জনগোষ্ঠী যারা সভ্যতার গুণাবলীতে সমৃদ্ধ অগ্রসর বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙালী জনগোষ্ঠী পূরাপূরি এই গন্ডিতে পড়ে না। তাই তারা তাত্ত্বিক অর্থে পরিপূর্ণ উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী শ্রেণীভুক্ত লোক নয়। শাব্দিক অর্থে অবাঙালী লোকেরা সংখ্যালঘু হিসাবে উপজাতি মানে শাখা জাতি। প্রাচীন গোত্র গোষ্ঠী ধরনের স্থানীয় লোক বলে আদিবাসী এবং পাহাড়বাসী হওয়ার কারণে পাহাড়ী। এই লোকেরা একাংশে উপজাতি, আর একাংশে তা নয়। উপজাতি সংজ্ঞাটি তাত্ত্বিক, না আভিধানিক, তা সরকারীভাবে পরিষ্কার নয়। স্থানীয় পরিষদ আইনে যথার্থতা যাচাই ছাড়াই, উপজাতি সংজ্ঞা ও তার তালিকা, প্রণীত ও সংযুক্ত হয়েছে। এটি জনসংহতি সমিতির দাবীরই হুবহু প্রতিফলন, যা তার উত্থাপিত পাঁচ দফা দাবীনামায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

স্থানীয় পরিষদ আইনে উল্লেখিত উপজাতীয় তালিকা ঃ

(১) চাকমা (২) মারমা (৩) তনচৈংগা (৪) ত্রিপুরা (৫) লুসাই (৬) পাংখু (৭) খিয়াং (৮) ম্রো (৯) বোম (১০) খুমি (১১) উচাই (১২) চাক।

কেউ কেউ মনে করেন ঃ ম্রো ও মুরং একই সম্প্রদায়, আর অনেকের ধারণা হলো ঃ এরা দুই পৃথক সম্প্রদায়। আদমশুমারীতে তাদের পৃথক পরিসংখ্যান আছে এবং তাতে মুরংরাই সংখ্যায় অধিক। কিন্তু স্থানীয় পরিষদের প্রতিনিধিত্বের তালিকায় ম্রোরাই উল্লেখিত। মুরুংরা ম্রোদের ব্রেকেটভুক্ত অবহেলিত। বলা যায় ঃ তারা প্রতিনিধিত্ব ও স্বীকৃতি না পাওয়া অপরাপর অবাঙালীদের দলভুক্ত।

আইনে উপজাতিদের বিপক্ষরূপে কেবল অউপজাতি সংজ্ঞাটাই আছে, কোন সম্প্রদায়ের নাম বা তালিকা নেই। স্থানীয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ও একক প্রধান

জনগোষ্ঠী এবং সর্বোপরি শাসক শ্রেণীর লোক হলেও বাঙালী নামের উল্লেখ আইনটিতে ঘুণাক্ষেরেও নেই। উপজাতি বহির্ভুত অন্যান্য অবাঙালীরা আইনটিতে উল্লেখিত হয়নি। তদুপরি তারা অউপজাতি কিনা তাও পরিষ্কার নয়। অউপজাতিভুক্ত প্রতিনিধি কোটায় এ পর্যন্ত বাঙালীরাই একচেটিয়া গৃহিত।

তবে ভিন্ন অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী যারা সংখ্যালঘু ও উপজাতি রূপে গণ্য যথাঃ

(১) নেপালী (২) আসামী (৩) গারো (৪) মনিপুরী (৫) রিয়াং (৬) সাঁওতাল (৭) মুরুং (৮) কুকি (৯) সেন্দু (১০) রোহিঙ্গ্যা (১১) রাখাইন।

বাঙালীরা সংখ্যা সামর্থে স্বঘোষিত প্রধান সম্প্রদায়। তারা নিজেদের অধিকার ও অবস্থান রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু উল্লেখিত সংখ্যালঘুরা নেহাতই অসহায়। তাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণ লাভ অনিশ্চিত অথচ হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলে পৃথককৃত মাইনী সার্কেল, অভিবাসী নেপালীদের বাসস্থানরূপে চিহ্নিত। এখন তারা সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত। ঐ এলাকাটি এখন জবর দখলাধীন চাকমা সার্কেল। এবার জেলা পরিষদ আইনে তাদের স্বীকৃতিও লোপ পেয়েছে। সাহসী ও যোদ্ধা জনগোষ্ঠী কুকি ও সেন্দুদের অভিযান কাহিনী, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ধারণ করে আছে। এরা সংখ্যায় যা-ই হোক, স্বমহিমায় উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালেরা দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজেদের শ্রমের দ্বারা সুগম করতে সারা বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে, মূল্যবান অবদান রেখেছে। এমনি বর্ণিত অন্যান্য সহযোগীরা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, যোগাযোগ, উৎপাদন ও নির্মাণ কাজে সহায়তা দান করেছে। এ লোকেরা বংশানুক্রমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দা ও জমি বাড়ির মালিক। তাদের প্রতিনিধিত্ব ও স্বীকৃতি লাভ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো ঃ এরা আজ উপজাতীয় রাজনীতির হাতে বলি। স্থানীয় বাঙালীরা ও সে রাজনীতির গিনি পীগ।

জনসংখ্যা (আদমশুমারী ১৯৯১ খ্রীঃ)

সম্প্রদায়	রাঙ্গামাটি জেলা	খাগড়াছড়ি জেলা	বান্দরবান জেলা	মোট	%
ক) উপজাতি =					
১. চাকমা	১৫৭৩৮৫+	৭৭৮৬৯+	৪১৬৩=	২৩৯৪১৭=	২৫৫%
২. মারমা	৪০৮৬৮+	৪২১৭৮+	৫৯২৮৮=	১৪২৩৩৪=	১৪.৬১%
৩. ত্রিপুরা	৫৮৬৫+	৪৭০৭৭+	৮১৮৭=	৬১১২৯=	৬.২৬%
৪. তৈনচংগা	১৩৭১৮+	৩৮৩০+	৫৪৯৩=	২২০৪১=	২.২২%
৫. বোম	৫৪৯+	.+	৬৪২৯=	৬৯৭৮=	০.৫৫%
৬. চাক	৩১৯+	.+	১৬৮১=	২০০০=	০.২১%
৭. খুমি	৯১+	.+	১১৫০=	১২৪১=	০.১১%

৮. খিয়াং	৫২৫+	.+	১৪২০=	১৯৪৫=	০.২০%
৯. লুসাই	৪৩৬+	-+	২২৬=	৬৬২=	০.০৭%
১০. ম্রো	১২৬+	-+	-+	১২৬=	০.০০%
১১. পাংখু	৩১২৮+	-+	৯৯=	৩২২৭=	০.৩০%
১২. উচাই	-	-+	৭৬২=	৭৬২=	০.০৭%
খ) সংখ্যালঘু অউপজাতি (মুরুং নেপালী ইত্যাদি)			-	২২৮৬৬+	২.৩০%
গ) বাঙালী অউপজাতি	১৭৬৮৯৬+	১৭৪৯৬৯+	১২০২৩৬	৪৭২১০১=	৪৮.৭৫%

এখানে উল্লেখ্য যে উপজাতিরা সংখ্যায় ৪৮.৮৫% এবং বাঙালী সহ অউপজাতীয় সংখ্যালঘুরা ৫১.১৫%। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম কেবল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নয়।

এখানে আদমশুমারী ১৮৭২ তুলনীয়। পৃষ্ঠা খণ্ড-৬ দ্রষ্টব্য

উপজাতিরা নিজেদের গোত্রীয় প্রধান বা অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রধান গোত্র-পতিরা রাজা নামে আখ্যায়িত, যথা ঃ চাকমা রাজা, বোমাং রাজা ও মাং রাজা। তাদের অধীন উপ-প্রধানরা হলেন ঃ হেডম্যান, কারবারী, দেওয়ান, খীসা, রোয়াজ ও আহ্বন।

১০। চাকমা সহ উপজাতীয় বহিরাগমন .

প্রমাণ নং-১।

রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত প্রত্ন নিদর্শন, রাজা শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীলমোহর, যার ভাষ্য হলো : "রোসান, আরাকান, আল্লাহ রাব্বি, ১১১১ শের জব্বার খান।" যদ্বারা বুঝা যায়, ঐ রাজার সময়কালে চাকমারা আরাকানের রোসাং অঞ্চলবাসী ছিলেন। তাঁর সর্দারীকাল, ঐ সীলমোহর অনুযায়ী ১১১১ মঘী মোতাবেক ১৭৪৯ খ্রীঃ সালে শুরু। বিভিন্ন বিবরণে ১৭৬৫ খ্রীঃ সালে তাঁর মৃত্যু ও পুত্র নূরুল্লা খান ক্ষমতাসীন হয়েছেন বলে জানা যায়। ঐ সালটিতে চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত এতদাঞ্চলে পরিপূর্ণ বৃটিশ শাসনের সূচনা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য ৯ম খণ্ডে প্রদত্ত সীলমোহরের ছাপ চিত্র।

প্রমাণ নং-২।

আদি চাকমা রাজা বলে খ্যাত জনৈক শের মস্ত খাঁ, কিছু চাকমা অনুসারীসহ চট্টগ্রামের মোগল নাজিম জুল কদর খাঁনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে কোদালা উপত্যকায় পুনর্বাসিত হোন। তিনিও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন আরাকানত্যাগী উদ্বাস্তু। তাঁর ঐ দেশত্যাগ ও অভিবাসনের কথা অধ্যাপক এ. এম. সিরাজুদ্দিন "অরিজিন ওফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিলট্রাক্টস" নামীয় একটি গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তার আরো আগে ১৭১১ খ্রীঃ সালে আরাকানত্যাগী চন্দন খাঁ, দক্ষিণ-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর শেষ বংশধর জালাল খাঁ ১৭২৪ সালে মোগলদের দ্বারা অবাধ্যতার অপরাধে দলবলসহ আক্রান্ত ও বিতাড়িত হোন। ওদের সাথে চাকমাদের রক্তগত সম্পর্ক থাকা সমর্থিত নয়। ওদের কথাও অধ্যাপক এ. এম. সিরাজুদ্দিন সাহেবের প্রবন্ধে উল্লেখিত আছে। সূত্র : জার্নাল অফ দি পাকিস্তান হিস্টোরিকেল সোসাইটি করাচি ভলিউম XIX Part-1 জানুয়ারি ১৯৭১। এই তথ্য সমর্থন করে রাণী কালিন্দির দেওয়াল লিপি ও একটি চাকমার লৌকগীতি যাতে শেরমস্ত খাঁ আদি রাজা বলে স্বীকৃত।

প্রমাণ নং-৩।

চাকমাদের বহুল চর্চিত ঐ লোকগীতিতেও গর্বের সাথে স্বীকার করা হয় যে, তাদের পূর্ববর্তী বাসস্থানগুলোর একটি হলো আরাকানের রোসাং, যথা : চাকমা লোকগীতি:

ক) আদি রাজা শের মস্ত খাঁ, রোয়াং ছিলো বাড়ী,

তারপর শুকদেব রায় বান্ধে ৬।।মদারী।"

তাদের আরেক স্বদেশভূমি হলো : অখ্যাত অজ্ঞাত এক চম্পক নগর, যথা : লোকগীতি:

খ) "এলে মৈসাং লালচ নেই

ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই

চল ভেই লোগ চল যেই

চম্পক নগর ফিরি যেই।"

প্রমাণ নং-৪।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি, এইচ লুইনকে, এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করা হয়ে থাকে। তিনি স্বীয় পুস্তক "দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন"-এর ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন :

A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hills, undoubtedly came about two generations ago from Arracan. This is assurted both by their own traditions and by records in the Chittagong collectorate. It was in some measure due to the erodus of hill tribes from Arracan, that the Burmese war of 1824 took place, which ended in annexation to British territory, of the fertile province of Arracan. As this is a point interesting, not only from its local bearing on the hill tribes, but also in a larger and more important historical sense, I shall trace here the way in which the dissensions between the English authorities and Burmese, which eventually culminated in war, hinged in a great measure upon refugees, from the hill tribes, who fleeing from Arracan into our territory, were pursued and demanded at our hands by the Burmese. Among the earliest records that we have of our dealings with the Burmese, are two letters, written, one by the King of Burmah, ant the other by the Rajah of Arracan, to the Chief of Chittagong, and received about the 24th June 1787.

(Ref : THE HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND THE DWELLERS THEREIN page 28/29) বাংলা : "উপজাতীয়দের যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে বসবাস করছে, তাদের অধিকাংশ প্রায় দু'পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐসব দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত, যা চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। আরাকান থেকে উপজাতীয়

লোকজনের পলায়ন হলো অন্যতম কারণ যদরুণ ১৮২৪ খ্রীঃ সালের ব.. যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, যেটি বৃটিশ ভারতের সাথে উর্বর আরাকান প্রদেশের সংযুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ঘটনাটি শুধু স্থানীয় পাহাড়ী উপজাতিগুলোর কারণেই নয়, বরং আরো গুরুতর ও ঐতিহাসিক কার্যকারণেও হৃদয়গ্রাহী। আমি এখানে সে ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করতে চাই, যদ্দরুণ বৃটিশ ও বর্মী কর্তৃপক্ষের মাঝে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, ও যুদ্ধের পরিণতি লাভ করে, আর তা হলো, পাহাড়ী উপজাতিদের বিপুল সংখ্যায় আরাকান ত্যাগ, ও আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ, যাদেরকে অনুসরণ ও ফেরৎ চেয়ে বর্মী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ ও দাবী উত্থাপন করেন।

বর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সর্বাধিক প্রাচীন দলিল হলো দু'টি চিঠি, যার একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক এবং অপরটি আরাকানের রাজা কর্তৃক, আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিত হয়, যা সম্ভবত ঃ ২৪ শে জুন ১৭৮৭ খ্রীঃ তারিখে পাওয়া যায়। (সূত্র ঃ দি হিলট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন, পৃঃ ২৮/২৯)

মিঃ লুইন অতঃপর আরাকানের রাজার চিঠিখানার পরিপূর্ণ ইংলিশ ভাষ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরে পুনরায় বলেন ঃ

This letter is explicit enough. The fugitives referred to are evidently men of the Chuckma and Mrung hill tribes, who to this day preserve the recollection of their ancestor's flight from Arracan. The persons in question were probably the chiefs of the clans, and the driving of them from British territory would have been equivalent to the expulsion of the whole clan.(Ref: do page 29)

বাংলা ঃ এই চিঠিখানা যথেষ্ট বিশদ। বর্ণিত পলাতকেরা প্রমাণিতভাবে পাহাড়ী উপজাতীয় চাকমা ও মুরং সম্প্রদায়ের লোক, যারা এখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের আরাকান ত্যাগের স্মৃতিকথা ধারণ করে আছে। বিতর্কিত ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ তাদের দলপতি, যাদেরকে বৃটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বিতাড়ণের অর্থ গোটা সম্প্রদায়কেই বিতাড়ণ।(সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)

প্রমাণ নং-৫।

১৭৮৭ খ্রীঃ সালের জুন মাসে, চট্টগ্রামের বৃটিশ শাসককে লিখিত আরাকানের রাজার চিঠি, যথা ঃ

From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our territories are composed of five hundred and sixty countries and we have ever been on terms of friendship. The inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries

belonging to us. A pe..on named Keoty having absconded from our country. took refuge in yours. I did ont however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possessions refused to sent him to me. I also am possessed of extensive country and keoty in consequence of his disobedient conduct and the strength and influence of my king's good fortune was destroyed.

``Domcan, Chukma and Kiecopa, lies, Marring and other inhabitants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishman at the mouth of the Naf, and stole away everything he had with him. Hearing of this I am come to your boundaries with an army in order to sieze them, because they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robbers, It is not proper that you should give asylum to them or the other Moghs who have absconded from Arracan and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may secured. If you do not drive them from your country and give them up, I shall be under the necessity of seeking them out with an army, in whatever part of your territories they may be. I send this letter by Mohammed wassene. Upon the receipt of it. either drive the Moghs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer immediately." (Page : 29)

বাংলা ঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের উদ্দেশ্যে ঃ

আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের দেশসমূহের অধিবাসীদের সাথে স্বেচ্ছায় আর অবাধে অন্যান্য দেশবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। কেওটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে ধাওয়া করছি না, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছি, এই আশায় যে, কেওটিকে ধরে অবশ্যই আমার হাতে তুরে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি তার অবাধ্য আচরণ আর আমার

রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাবগুণে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডোমকান, চাকমা, কায়কোপা, লাইচ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে, এবং উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা নাফ নদীর মোহ-নায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে, তার যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এটি শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু তারা নিজেদের স্বদেশত্যাগ করেছে আমার রাজার প্রতি অবাধ্য এবং দস্যু বৃত্তিতে লিপ্ত, সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও, যারা আরাকান থেকে পালিয়ে গেছে, আশ্রয়দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচীন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে, এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান, ও ধরে হস্তান্তর না করেন, তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানেই তারা থাকুক না কেন, একদল সৈন্য নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠালাম। এটি বুঝে পেয়ে হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, অথবা তাদেরকে আশ্রয় দিবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র প্রত্যুত্তরে জানাবেন।'

(সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)

প্রমাণ নং-৬।

১৭৮৪ খ্রীঃ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক, আরাকান রাজ্য দখল ও তথায় অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের ফলে সে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী নিরাপদ আশ্রযের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসে। তখন উদ্বাস্তু আরাকানীরা স্বদেশ উদ্ধারের জন্য অভিযানও চালাতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত আভা সরকার ও বিদ্রোহী আরাকানীদের মাঝে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষগুলো উদ্বাস্তু আগমনকে আরো বাড়িয়ে তুলে, এবং তাতে বার্মা ও বৃটিশ উভয় সরকারের মাঝে তিক্ততা চরম আকার ধারণ করে। ঐ সালেই উভয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং আরাকান বৃটিশদের দখলিভূত হয়ে, ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। তখনকার ঐ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আরাকানীদের দীর্ঘ অবস্থানের কারণে, আশ্রয়দাতা দেশই তাদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালীরা পটুয়াখালীর মগ ও কক্সবাজারের রাখাইনরা, সেই তাদেরই বংশধর। চাকমারাও সেই উদ্বাস্তুদের একটি অংশ।

ক) মিঃ লুইন ঐ ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন যথা ঃ

These letters were recived during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the Sirdar of Arracan. The Chief of Chittagong in the same month of june, writes to the Governor General in Council,

reporting this incurs ı and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance until this armed force was withderwn. At the same time he states that in his opinion the refugees should be driven out of British territory. He adds also that these fugitives were persons of some consequence in Arracan, and reports, further that a chakma Sirdar who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by stating his opinion that this Sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jungles for the convenience of plundeing. Ten years before this in the year 1777, it appears from a letter dated 31st May, from the Chief of Chittagong to the Honourable Warren Hastings Governor General that some thousands of hill men had come from Arracan into the Chittagong limits, having been offered encouragement to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and (Macfarlane's History of British India, page 355,) records that in 1795 a Burmese army of 5,000 men again pursued some rebellious chiefs or as they called them robbers right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and two out of the three were put to death with atrocius tortures.

In 1809 Macfarlane records that disputes continued to occur in the frontiers of chittagong and Tipperah but the organized forays into that territory hardly assumed any narrative definit form until 1823 (Wilson's The Narrative of tht Burmese War page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824. The primary cause, there fore, of all these disturbence, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtedly the emigraion to our hill tribes hitherto subject to their authority.

The origin of The tribes is a doubtful point. Pemberton ascribes them a Maloy descent. Colonel Sir A. Phayre considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of Myamma or Burmese extraction. Among the tribes

তাতে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুরুসুগিরি তথা মইসাগিরি বা মইসাং ও তার সাথে সম্পর্কিত চাকমা ও অন্যান্য জনসাধারণের মৌলিক আবাসক্ষেত্র বাংলাদেশ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি কালের কাছাকাছি সময় কালেও যখন বৃটিশ শাসনের চার দশক সময়কাল প্রায় অতিবাহিত, তখনো বাংলাদেশ অঞ্চলে চাকমাদের আগমন নির্গমন অব্যাহত ছিলো। অতএব এটা সন্দেহাতীত যে, চাকমা ও তাদের সঙ্গী সাথী উপজাতিরা আসলে বিদেশী বংশোদ্ভুত, যাদের অন্যতম আবাসস্থল হলো আরাকানের মুরুসুগিরি বা মৎস্যগিরি অঞ্চল। গিরি পদবিটিও তাদের প্রাচীন রাজা বিজয়গিরি সূত্রে প্রাপ্ত।

প্রমাণ নং-৭।

১৫৫০ খ্রীঃ সালে অংকিত বাংলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের একটি প্রাচীন মানচিত্রে পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও দে বারোজ একটি চাকোমা নামীয় অঞ্চল প্রদর্শন করেছেন, যা রাইংখ্যং ও সুবলং উপনদী দুটির উৎস অঞ্চলের পূর্বে চীন পাহাড় এলাকায় অবস্থিত। তাতেও প্রমাণিত হয়, উত্তর আরাকানে চাকমাদের আবাসভূমি ছিলো। (সুত্র ঃ দি ম্যাপ অফ জুয়াও দে বারোজ ডেটেড এবাউট ১৫৫০ খ্রীঃ ডঃ আব্দুল করিম, জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৩ ভলিউম-VIII নং-২)

প্রমাণ নং-৮।

আরাকানের মগদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েই চাকমারা এতদাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে। এটা তাদের লোকগীতির দ্বারাও সমর্থিত, যথাঃ

তৌনে রানি নি ভাত খেলাক

সমুন্দর সাগর নি লাগ পেলাক

লই নেই সমারে সৈন্য গণ

রোয়াং কুলে লুঙ্গে গৈ রাধা মন

বর্জিত বাজিল ধল বাছা

মগ রাজা কত্তে এলো কোন রাজা

কয় মগ রাজা রাধারে

রেজ্য গঝেই দেঙোর তোয়ারে

সূত্র ঃ রাধা মোহন ধন পতির পালা

প্রমাণ নং-৯।

বৃটিশ সরকার সর্বপ্রথম ১৯০০ খ্রীঃ সালে আইনের দ্বারা অধিকাংশ বহিরাগত অবাঙ্গালীর রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে, এতদাঞ্চলে তাদেরকে অভিবাসী বলে ঘোষণা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারাই তার প্রমাণ, যথা ঃ

Immigration in to the Hill tracts.

Save as here in after provided, no person other than a Chakma, Mogh or a member of any hill tribe, indigenous to the Chittagong. Hill tracts, the lushai hills, the Aracan hill tracts, or the State of Tripura, shall enter or reside within the Chittagong Hill tracts, unless he is in possesion of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion.

বাংলা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন।

নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী থাকা ব্যতিরেকে চাকমা মগ অথবা এমন কোন পাহাড়ী উপজাতীয় সদস্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড়, পার্বত্য আরাকান অঞ্চল অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী বাসিন্দা, এমন লোক ব্যতীত অপর কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ অথবা বসবাস করতে পারবেনা, যদি না তার অধিকারে জেলা প্রশাসকের বিবেচনা প্রদত্ত কোন অনুমতি পত্র থাকে।

এই আইনে চাকমা ও মগদের উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী বলা হয়নি।তারা বিদেশাগত বাসিন্দা তথা অভিবাসী। লুসাই ত্রিপুরা আর অন্যান্য আরাকানীরাও স্থানীয় অধিবাসী নয়, নামেই তারা বিদেশী পরিচিত। এসবের প্রতি স্থানীয় উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ীজ্ঞাপক সংজ্ঞার প্রয়োগ এক প্রচলিত বিভ্রান্তি। ত্রিপুরাবাসী, লুসাইবাসী ও আরাকানবাসী উপজাতিদের স্ব-স্ব অঞ্চলের পাহাড়ী আদিবাসী বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়। চাকমা ও মগেরা স্থানীয় নামহীন আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

প্রমাণ নং-১০।

The tribes consider themselve decendents of emigrants from Bihar, who came over and settled in this parts in the days of the Arakanies king.

(Ref: An Accoun of Chitagong Hill Tracts. by S. H. Hutchinson, page-89)

বাংলা ঃ এই উপজাতীয় লোকজন নিজেদেরকে দেশত্যাগী ঐ সব বিহারবাসীদের বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখন্ডে আরাকানী রাজাদের শাসনকালে আবাস স্থাপন করেছে। (সুত্র ঃ এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ঃ এস এইচ. হাচিনসন, পৃঃ৮৯)

প্রমাণ নং-১১।

চাকমা রাজা মাননীয় ভুবন মোহন রায় স্বীয় পুস্তিকা 'চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস"- এ উল্লেখ করেছেন ঃ চাকমাদের প্রথম রাজ্য হলো নেপালের নিকটকার হিমালয় পাদদেশভুক্ত কল্প নগর। দ্বিতীয় রাজ্য ও রাজধানী হলো ইরাবতী নদী তীরবর্তী উজানের চম্পক নগর এবং তৃতীয় রাজ্য হলো বার্মার অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ, যেখান থেকে মগ অত্যাচার ও বিতাড়নহেতু বাংলাদেশ অঞ্চলে তাদের আগমন ঘটেছে।

প্রমাণ নং-১২।

চাকমা লোকগীতি ঃ চাটিগাং ছড়া/ছাড়া পালা ও রাধা মোহন ধনপতির পালাতে ও নিম্নাকারে তাদের আরাকান অভিযান ও রাজ্য জয়ের বর্ণনা আছে, যথা ঃ

ক) চাকমা ভাষ্য ঃ

তৌনে রানি নি ভাত খেলাক,
সমুন্দর সাগর নি লাগ পেলাক।
লৈ নেই সমারে সৈন্যগণ,
রোয়াং কূলে লুঙ্গেগৈ রাধা মো'ন।
বর্জিত বাজিল ধল বাচা,
মগ রাজা কত্তে এলো কন রাজা?
রাধা মোনর ছাস ডাঙর
আস্তে আস্তে মগ রেজ্য মারি লর।
মগে গত্তন হাহাগার,
চাঙমায় গত্তন মগেরে অনাচার।
কয় মগ রাজা রাধারে
রেজ্য গজেই দেঙগর তোয়ারে।
গয়া গঙ্গা গর লুং দান,
চাঙে তোত্তন পরাণ নান।

সুত্র ঃ (১) রাধা মোহন ধনপতির পালা (২) চাকমা জাতি ঃ সতীশ ঘোষ।

খ) বাংলা ভাষ্য ঃ

তরকারী রেঁধে ভাত খেলে,
সমুদ্রসাগর লাগ পেলে।
সঙ্গে নিয়ে সৈন্যগণ,
রোয়াং কূলে পৌছে গেল রাধামোহন।
বর্শিতে বিধেছে ধলা বাচা,
মগ রাজা কয় এলো কোন রাজা?
রাধা মো'ন বাড়ন্ত সাহসে,
মগ রাজ্য জয় করে নেয় শেষে।
করছে মগেরা হাহাকার,
চাকমা করছে মগ উপর অনাচার।
কয় মগ রাজা রাধারে
রাজ্য গছিয়ে দিচ্ছি তোমারে।
গয়া গঙ্গা করলাম দান
চাই তোমার কাছে পরাণ খান।

সূত্র ঃ (১) রাধা মোহন ধনপতির পালা
(২) চাকমা জাতি ঃ সতীশ ঘোষ।

প্রমাণ নং-১৩।

চাকমা বৈদ্য মহলে একটি স্বতন্ত্র বর্ণমালার চর্চা হয়, যে বর্ণমালাকে সাধারণতঃ চাকমা বর্ণ বলা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞজনদের বর্ণনা মতে, এটি খেমার বর্ণ, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত। কোন কোন পন্ডিতমনে করেন, এ বর্ণ মালাটি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাম্মী লিপিরই একটি সংস্করণ। এতেও প্রমাণিত হয়, চাকমারা চট্টগ্রামী মূলের লোকসমষ্টি নয়, তারা বহিরাগত।

প্রমাণ নং-১৪।

চাকমা ভাষা বহুল পরিমাণে হিন্দী প্রভাবিত, যথা ঃ হিন্দী ক্রিয়াপদ ঃ যায়েঙ্গে, চাকমা ক্রিয়াপদ ঃ যেবোংগে। হিন্দী বিশেষ্যঃ লোগ, চাকমা বিশেষ্যঃ লোগ। হিন্দী বহুবচন ঃ হাম, হামি, চাকমা বহুবচন ঃ আমি। হিন্দী বহুবচন ঃ তুম, তুমহি, চাকমা বহুবচন ঃ তুমি ইত্যাদি। এটাও তাদের বর্হিদেশীয় হওয়ার প্রমাণ। এই সুত্রে প্রশ্ন ঠ ঃ তাদের আদি বাসস্থান আরাকান না বিহার? এ দুয়ে সামঞ্জস্য নেই। এর উত্তর হলো, অতীতে চাকমারা মগ অঞ্চলের বাসিন্দাই ছিলো। 'মগধা' তাদের ব্যবহৃত কটুবাক্য হওয়ায় ভাবা যায়, কোন এককালে মগধবাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হয়ে প্রথম থেকে সপ্তম শতাব্দী কালের মধ্যে ভারতীয় ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশকারীদের সাথে তারাও আরাকানবাসী হয়েছে। এই অর্থে তারা ও এহুদীদের মত প্রাচীন উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী।

প্রমাণ নং-১৫।

মাতামুহুরী উপত্যকা অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত ও শাসনভুক্ত এলাকা ছিলো। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেকাংশ প্রথমে ১৩৩৯-৪০ খ্রীঃ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ কর্তৃক বিজিত হয়। আরেকবার ১৫১২ খ্রীঃ সালে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এতদাঞ্চল দখল করেন। তারই নিযুক্ত অন্যতম স্থানীয় শাসক ছিলেন জনৈক খোদা বখশ খান, যার শাসনাধীন এলাকা ছিলো আলীকদম সহ দক্ষিণ চট্টগ্রাম। চাকমাদের দাবী হলো ঃ ঐ আলীকদম ছিলো এককালে তাদের রাজ্য বা রাজধানী। শ্রুতি কথায় ব্যক্ত আছে ঃ কথিত আলী কদমেরই নিকটকার তৈনছড়ির তীরে একদা চাকমাদের রাজা নির্বাচন পালা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাঁশ বেতের দ্বারা প্রস্তুত একটি সিংহাসনে রাজা ধাবানা আসন গ্রহণ করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী পীড়াভাঙ্গা তাড়াহুড়ার ভিতর স্ত্রীর বক্ষ বন্ধণীতে পাগড়ী বাঁধায় আযোগ্য ঘোষিত হোন। কিংবদন্তি আছে, নীচে বাঁকখালির পারে অবস্থিত চাকমা কুল, রাজা কুল ও দক্ষিণের ঝলোংঝা অঞ্চলটি, তাদেরই সম্প্রসারিত আধিপত্যের স্মারক।

ঐ অঞ্চলের সুলতানী শাসক খোদা বখশ খানের নাম ও খেতাব সুত্রে বলা যায়, একাদিক্রমে দশ জন চাকমা প্রধানের নাম ও খেতাবে, ইসলামী ও মুসলিম ভাষা ঐতিহ্য ব্যবহৃত হওয়ায়, ইঙ্গিত মিলে, হয়তো তারা ঐ খোদা বখশ খানেরই বংশধর। শাসন ও জনপ্রিয়তার সুত্রে তারা চাকমাদের রাজা রূপে মান্য হয়েছেন। মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত ঐ দশজন চাকমা রাজা রাণীর বিবরণ, জনাব অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের বর্ণনা, চাকমা রাজা ও রাণীদের সীলমোহর ও সরকারী দলিল পত্রের দ্বারা প্রমাণিত। যথা ঃ

১। শের মস্ত খাঁ	কার্যকাল	১৭৩৭ খ্রীঃ
২। সোনা বি	কার্যকাল	১৭৪০ "
৩। শের জব্বার খান	কার্যকাল	১৭৪৯ "
৪। নুরুল্লা খান	কার্যকাল	১৭৬৩/৬৫ "
৫। ফতেহ খান	কার্যকাল	১৭৭১"
৬। শের দৌলৎ খান	কার্যকাল	১৭৭৩"
৭। জান বখশ খান	কার্যকাল	১৭৮৩ "
৮। তব্বার খান	কার্যকাল	১৮০০"
৯। জব্বার খান	কার্যকাল	১৮০১"
১০। ধরম বখশ খান	কার্যকাল	১৮১২"

যদি খোদা বখশ খাঁর সাথে এদের রক্তগত সম্পর্ক মান্য না হয়, তা হলে এ কথাই ভাবতে হবে যে, আরাকানী ঐ সব অভিজাতদের সাথে তাদের বংশগত সম্পর্ক থাকা সম্ভব, যারা মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম হলো ঃ ঐ ব্যক্তিরা ছিলেন মগ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান, এবং তাদের বিকল্প মঘীনাম উপাধিও এক সাথে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু চাকমা প্রধানদের বেলায় তা অনুপস্থিত। সুতরাং চাকমা প্রধানদের একক খাঁটি মুসলিম পরিচিতি, আরবী ভাষা বর্ণ ও ইসলাম চর্চাকে, মুখোশ ভাবার অবকাশ নেই। তাদের অমুসলিম হওয়াটা অবিশ্বাস্য।

চাকমা সর্দার মহলে মুসলিম নাম ও খেতাব ধারণের ঐতিহ্য রাজা হরিশ চন্দ্র থেকেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনি ১৮৭২ সালে রায় উপাধিসহ চাকমা প্রধান রূপে অভিষিক্ত হোন। তার এই অমুসলিম নাম হলো পিতৃ প্রদত্ত। নিজের মত তার পিতাও ছিলেন অমুসলিম নামধারী গোপী নাথ। যদিও তদোর্ধ পিতৃ পুরুষদের অনেকে মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত ছিলেন। খোদ রাজমাতা চিকন বিবি, রাজ ঐতিহ্যসূত্রে আজীবন বিবি সম্বোধিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন রাজা ধরম বখশ খাঁর কন্যা। মুসলিম নাম খেতাবের ঐতিহ্য পরিত্যক্ত হলেও, এখন পর্যন্ত অভিষেক ও পুন্যাহ উপলক্ষে মোগলাই কায়দায় দরবার বসে। মোগলাই সাজ পোষাকে সজ্জিত রাজা বাহাদুর, অভ্যাগতদের কুর্ণিশ নজর ও নিয়াজ গ্রহণ করেন। রাজা বাবুর আসতে যেতে, দরবার বসতে ভাংতে, ঢোর

সোহরত হয়, সানাই বাজে, আর পাগড়ি পরাতেও মৌলভী সাহেব লাগে। রাজা বাহাদুর ঘরে বাইরে সম্বোধিত হোন হুজুর ও রাণী সাহেবা বিবি বলে। চাকমা অভিজাত বিবি মহলে চিরকালই পর্দা মান্য। এবং ঐ অভিজাত মহলের পদবী হলো দেওয়ান, তালুকদার, খিশা ইত্যাদি। এই শেষোক্ত পদবিটি ফার্সী বহুবচন খেঁসার অপভ্রংশ, যার অর্থ আত্মীয়-কুটুম।

১১ । কতিপয় তথ্য উপাদানঃ

(ক) লোকগীতি : রাধা মোহন ধনপতির পালা।

চাকমা ভাষ্য ঃ

'নাজের উল্লাজে রাধামন,
খৈ-গাঙে পল্লাক গি সৈন্যগণ।
কোচি রান্ন্যা কাদা বন,
জয় নারান ইদু গেল রাধামন।
ইজরত নিগলি চান ন চান,
দ্বিসত তেঙ্গা দিলেও তিবিরা
হাম ন খান।
জালি পাগজ্যা লুঙ্গিলাক,
সিধু ছৈন্যগণ জিরেলাক।
জাদি পুজাত তে ঘি দিল,
খিয়াং রেজ্য জিদি নিল।
এবে জিদিল কাঞ্চন দেজ,
উল্লা ফিরি যেই পুগর দেজ।
পুগর রেজ্য কালিঞ্জর,
সিমিখ্যা রাধামন দিলো লর।

কালিঞ্জর রাজা গি গরলো,
পাথরী কিল্লা যোগাল্লো।
যুদ্ধত জিদি বাললো তেজ,
সিত্তুন গেলো অকসা দেজ।
তৌনে রানি নি ভাত খেলাক,
সমুন্দর ছাগর নি লাগপেলাক।
লৈ নেই সমারে ছৈন্য গণ,
রোয়াং কূলে লুঙ্গে গৈ রাধামন।
গাজো আগাদ তাগেদ ফুল,
লুম্বৈগে রাধামন সাপ্রেই কূল।
বর্জিত বাজিল ধল-বাজা,
মগ রাজা কত্তে এলো কন রাজা।

রাধামনর ছাস ডাঙর,
আস্তে আস্তে মগ রেজ্য মারিলর।
মগে গত্তন হাহাগার,
চাঙমায় গত্তন মগরে অনাচার।
কোয় মগ রাজা রাধারে,
রেজ্য গজেই দেঙগর তোয়ারে।
গয়া গঙা গরলুং দান,
চাঙে তোত্তন পরাণ নান।'

বাংলাঃ

নাচছে উল্লাসে রাধামন,

খোয়াই গাঙে পড়লো গিয়ে সৈন্যগণ।

কচি বিরান কাঁটা বন,

জয় নারায়ণের ওখানে গেলো রাধামন

মাচায় নিকলে চায় না চায়,

দ্বিশত টাকা দিলেও ত্রিপুরা

হাঁ না যায়।

জালি পাগজ্যা পৌছে গেলে,

ওখানে সৈন্যরা জিরিয়ে নিলে।

জাতি পূজায় ঘি দিলে,

খিয়াং রাজ্য জিতে নিলে।

এখন জিতিল কাঞ্চন দেশ,

উল্টা ফিরে যায় পূবের দেশ।

পূবের রাজ্য কালিঞ্জর,

সেদিকে রাধামন দিলো নড়।

কালিঞ্জর রাজা কি করলো,

পাথরী কিল্লা যোগাড়লো

যুদ্ধে জিতে বাড়লো তেজ,

সেখান থেকে গেলো অকসা দেশ।

তরকারী রেঁধে ভাত খেলে

সমুদ্র সাগর নাগাল পেলে।

সঙ্গে নিয়ে সৈন্যগণ,

রোয়াং কূলে পৌছে গেল রাধামন।

গাছের আগে ফুটন্ত ফুল

পৌছে গেল রাধামন সাপ্রেই কুল।

বড়শিতে বিধছে ধলা বাচা,

মগ রাজা কয় এলো কোন রাজা।

রাধা মোহনের সাহস বাড়ে,

আস্তে আস্তে মগ রাজ্য জয় করে।

মগেরা করছে হাহাকার,

চাকমারা করছে অনাচার।

কয় মগ রাজা রাধারে,

রাজ্য গছিয়ে দিচ্ছি আপনারে।

গয়া গঙ্গা করলাম দান

চাই আপনার কাছে পরাণ খান।

খ) রাজা ভুবন মোহন রায় বর্ণিত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)

অনেক দিন আগে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্য নামীয় এক রাজা বাস করতেন। কল্পনগর ছিলো তার রাজ্যের রাজধানী। একদা ঐ রাজ্যের মন্ত্রী শ্যামল স্বদেশ ত্যাগ করে হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ইরাবতী নদী এলাকায় নতুন এক রাজ্যের পত্তন, এবং ঐ নদীরই তীরে পুত্র চম্পাকলীর নামানুসারে চম্পক নগর নামীয় একটি নগর ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বংশেরই সম্বুদ্ধ নামীয় জনৈক রাজার পুত্র বিজয় গিরি আর উদয় গিরি। বিজয় গিরি ৭ চামুচ বা ছাব্বিশ হাজার সৈন্যসহ নদী পথে ছয় দিন ছয় রাতের যাত্রা শেষে তেওয়া নদীর মোহনা কালা বাঘায় অবতরণ করেন,এবং অধিকাংশ সৈন্যসহ আরো সম্মুখে যুদ্ধের জন্য নাপতিকে পাঠান। তিনি ইনডাং ক্রিনডাং পাহাড় ও টেকনাফের যুদ্ধে জয় লাভ করেন। তৎপর সেনাপতি স্বদেশ রওয়ানা দেন। বিজয় গিরিও ফিরতি পথে এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করেন যে, পিতা মারা গেছেন ও তদস্থলে ছোট ভাই সিংহাসন দখল করে নিয়েছে। এতে তিনি মনের দুঃখে বিজিত রাজ্যে ফিরে যান,

ও এক আরি মেয়েকে বিবাহ করেন। তার নিঃসন্তান তিরোধানের পর শ্বেত হস্তি কর্তৃক আনিত জনৈক সৈনিককে রাজা করা হয়। তার কন্যা মানিক বির গর্ভ ও জামাতা বাঙালী সর্দারের ঔরশজাত নাতি, মানিক গিরি হন পরবর্তী রাজা। বার্মা সাম্রাজ্য তখন তিন দেশে বিভক্ত ছিল, যার একটি ছিল চাকমা রাজার অধীন।

গ) রাণী কালিন্দি প্রদত্ত পাট্টা

'পাট্টা কবুল করার দাদে বকবুলিয়ত শ্রীঈশান চন্দ্র দেওয়ান পিছরে লবণ খাঁ দেওয়ান মৃত, সাকিন কাচালং জোম বঙ্গ, থানে কাচালং প্রতি, কামি দামি ইস্তিমেরারি তালুকি পাট্টা পত্রমিদং আগে আমার জমিদারীর অধীন কার্পাস মহাল সংক্রান্ত তোমরা সাবেক মুরচি তালুকদার মোট পাক্কা (১) ১১ ঘরের কাতে কাঁচা ১৭৩ ঘর রায়তের সালিয়ানা হস্তবুদ মবলক ১১২। ১০ গন্ডা, কোম্পানী বেশী ৭/৬ গন্ডা, পুন্যাহ নজর ১ টাকা, চিনার খরচা ১ টাকা, আগচলি ৫ টাকা, হদিশ আন ৪ টাকা, সাকুল্যে মং ১৩০ দ/১৬ গন্ডা, বাদস্বরূপ ২দ/০ বাকিস্থিত ১২৮/১৬ গন্ডা, খাজনার পরে তুমি তালুকী পাট্টা পাওয়ার দরখাস্ত করায় তাহা মঞ্জুরক্রমে তোমা হইতে কামি দামি ইস্তমিরামী তালুকী কবুলিয়ত লইয়া, কামি দামি ইস্তমিরারী তালুকী পাট্টা দিতেছি যে, নিরূপিত খাজনা, বাজে রকমসহ সন বসন তুমি ও তোমার পুত্র পুত্রাদি ক্রমে নীচের লিখিত কিস্তিমতে, চালান সম্বলিত আমার জমিদারী সেরেস্তাতে দাখিল করি দিয়া দাখিলা লইবা ও লইবেক। শটামিতে কিস্তিমতে খাজনা আদায় নাকরে ওনা করায় প্রচলিত কানুন জারিতে ও আগমস্য যাহা কানুন প্রচলিত হয়, তদ্বারাহ খাজনা গয়রো তোমার মাল মনকুলা স্থাবর সম্পদাদি ক্রোরক ও নিলাম বিক্রিপূর্বক আদায় লইতে কোন ওজর না করিবা,ও না করিবেক। ভেটবেগার নজর স্বীকার খাইন মাখট রসদ খর পটন খরচাও সাদি ক্রিয়াতে নজরানা ও খরচা পূর্ব মতে ও যখন যাহা উপস্থিত হয়, এবং হুজুরের অঙ্ক বেশী হয়, সব তালুকদারান সে মতে দিবা ও দিবেক। তালকা হেবা খারিজ আমার হুকুম বিনা না করিবা। বেআইনী কোন কর্ম না করিবা। তোমরা নিজে নিশা করিয়া তালুকাতে কোন ফৌজদারী মকর্দমা উপস্থিত হয়, তৎশীগ্রহ হুজুরে অথবা আমার নিকট এতেলা করিবা। তালুকায় রায়ত উৎবৃদ্ধ হয়, নিরূপিত জমামতে তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারান ভোগবান থাকিবা ও থাকিবেক। রায়ত ফতেফেরাল হয় বা খাজানা আদায়ের পক্ষে কোন ওজর না করিবা ও করিবেক। জব্দ জরীপে আমার মালিকিতে তোমার তালুকা ধরাইবা। তালুকার রায়ান রানা রানী খিসা সাবেক মতে দখলে রাখিবা। এতদর্থে কামি দামি ইস্তি মিরারী তালুকার পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৩১ মং তারিখ ২ আষাঢ়-'

(স্বাক্ষর)

শ্রীমতি কালিন্দি রাণী

[সূত্র ঃ চট্টগ্রাম-আরাকান পৃষ্ঠা ঃ ৬২/৬৩ জনাব আব্দুল হক চৌধুরী) প্রাচীন আরাকান পৃঃ ৩৫/৩৬]

ঘ) ইউরোপীয় গবেষকদের গবেষণা সুত্রে আরাকানের সতের জন রাজার ইসলামী নাম জানা যায়। সেই সতের জন রাজার আরাকানী নাম ও মুসলামানী নাম পদবীর তালিকা রাজত্বকালসহ নিম্নে উদৃত হল ঃ

আরাকানী নাম	রাজত্বকাল	মুসলমানী নাম
১। নরমিখলা	১৪৩২-১৪৩৪	সোলায়মান খাঁ
২। মিনখারী	১৪৩৪-১৪৫৯	আলী খাঁ
৩।বসপিউ	১৪৫৯-১৪৮২	কলিমা শাহ
৪। দৌলিয়া	১৪৮২-১৪৯২	মো-খু-শাহ
৫। বসউনিও	১৪৯২-১৪৯৪	মহমো শাহ (মোহাম্মদ শাহ)
৬। ইয়েনাউং	১৪৯৪	নূরী শাহ
৭। মলিংগথু	১৪৯৪-১৫০১	সকমক দৌলা
৮। মিনইয়াজা	১৫০১-১৫২৩	অজ্ঞাত
৯। কাসাবদি	১৫২৩-১৫২৫	আলী শাহ
১০। মিনসৌ	১৫২৫	জলা শাহ
১১। থাটাসা	১৫২৫-১৫৩১	আলী শাহ
১২। মিনবিন	১৫৭১-১৫৫৩	সুলতান জবৌকশাহ
১৩। মিনপালং	১৫৭১-১৫৯৩	সিকান্দার শাহ
১৪। মিনইয়াজাগি	১৫৯৩-১৬১২	সলিম শাহ
১৫। মিনখামৌং	১৬১২-১৬২২	হোসেন শাহ
১৬। থিরিথুধম্মা	১৬২২-১৬৩৮	দ্বিতীয় সলিম শাহ
১৭। নরপতিগ্যি	১৬৩৮-১৬৪৫	নাম দুষ্পাঠ্য

ঙ) জুম খাজনার উশোল ব্যবস্থা।

মোগল সরকার বা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কেউই পাহাড়ী উপজাতিদের উপর সরাসরিভাবে প্রভাব খাটাননি বা শাসন প্রয়োগ করেননি। তাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারাদি স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতো। বাংলা সরকার কেবল কার্পাস মহালের খাজনা আদায়ের এখতিয়ারই খাটাতেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত কার্পাস মহালের খাজনা সরকার সরাসরি নিজে আদায় করতেন না। তৃতীয় কোন পক্ষকে এর ইজারা দেয়া হতো। সাধারণত ঃ কোন বাঙ্গালী হিন্দুই তজ্জন্য নিযুক্ত হতেন, যিনি না উপজাতীয় হতেন, না তাদের প্রতি তার কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকতো। জালাল খানের সর্দারী কালে (১৭১৫-২৪ খ্রীঃ) জনৈক বিনোদ চৌধুরীকে মোগল কর্তৃক মাতা মহুরী অঞ্চলের কার্পাস মহালের ইজারা প্রদান করা হয়। ১৭৩৭-৫৭ খ্রীঃ মিয়াদে রাজা রাম চৌধুরী ইজারাদার নিযুক্ত হোন। পরবর্তী চার বছর বার্ষিক ২০০০ টাকা হারে ইজারা নিয়ে তিনি চাকমা রাজ নায়েব রনু খাঁর সাথে বার্ষিক ৫০ মন তুলা প্রদানের এক চুক্তিতে উপনীত হোন। এও সাব্যস্ত হয় যে, তুলা দানে অক্ষম হলে তাকে প্রতি মন তুলার বিনিময়ে নগদ সাড়ে চার টাকা হারে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। রনু খান এর বিপরীতে পাড়া, ও উপজাতিসমূহের মাতবরদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তুলা বা তার মূল্য আদায় করে নিতেন। ১৭৭৬-৮৭ মিয়াদকালে বিদ্রোহজনিত অসুবিধায় কোন জমা আদায় করা যায়নি। এই অসুবিধাদি বিবেচনার পর ১৭৮৯ সালে চট্টগ্রামের কালেক্টর, রাজস্ব বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করেন যে, উপজাতীয় সর্দারদেরই তুলা মহালগুলোর বন্দোবস্তি দেয়া হোক, যারা নিজেরাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা এবং উত্তরাধিকার সুত্রে স্থানীয়ভাবে কিছু প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ও বটে। সরকার এই সুপারিশে সম্মত হয়ে নির্দেশ দেন যে, একটি হালফিল জমাবন্দি নির্ধারণ করা হোক, যা তুলায় নয় নগদ টাকায় উশোল যোগ্য, এবং এটাও নিশ্চিত করা হোক যে, জুমিয়াদের উপর কোনরূপ বাড়তি দায় চাপান হবেনা। তদনুযায়ী কালেক্টর ১৭৯০ সালের জন্য ৫৩৮১ টাকা জমা ধার্য করে সর্দারদের কার্পাস মহালগুলোর ইজারা প্রদান করেন। পরবর্তী বছর জমা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭০৩ টাকায়। রাজস্ব বোর্ড এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে লেখেন আমরা ১৭৯১ সালের জমাবন্দি, যা অনুমোদিত ও জুমিয়াগণ কর্তৃক মান্য হয়েছে, অব্যাহত রাখতে আপনাকে কর্তৃত্ব দিচ্ছি। তবে আমরা চাই, সময় সময় মহালগুলোর জমা বৃদ্ধির বিষয়টি, যা জুমিয়াদের সংখ্যা ও চাষ বৃদ্ধির সাথে জড়িত, আমাদিগকে অবহিত করবেন।

অতিরিক্ত আরেক বিবরণে দেখা যায়, চাকমা সর্দার শের মস্ত খাঁকে স্থানীয় মোগল শাসক জুল কদর খাঁ, জুম খাজনা আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তার এই নিযুক্তি, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বহাল রেখেছেন। এর ব্যাখ্যায় বলা যেতেপারে ঃ শের মস্ত খাঁর এখতিয়ার সর্বব্যাপ্ত ছিলো না। কিছু অঞ্চল তার এখতিয়ারভুক্ত এবং বাকি অংশ ভিন্ন এখতিয়ারে ন্যস্ত ছিলো।

পরবর্তীকালে জুমিয়া জনসংখ্যা ও জুম চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৮৪৮ সাল নাগাদ বর্ধিত খাজনার পরিমান দাঁড়ায় ১১৮০৫ টাকায়। পঞ্চাশ বছরের মাথায় এই বৃদ্ধির হার প্রায় এক শত ভাগ। এটা স্বাভাবিক জন্মগত বৃদ্ধির সাথে বহিরাগমনজনিত যোগফল তথা জুমিয়া ও জুম চাষ বৃদ্ধির ফল বলেই ধরা যায়। (সুত্র ঃ রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ও অন্যান্য বিবরণ)।

এক বোম তরুণী
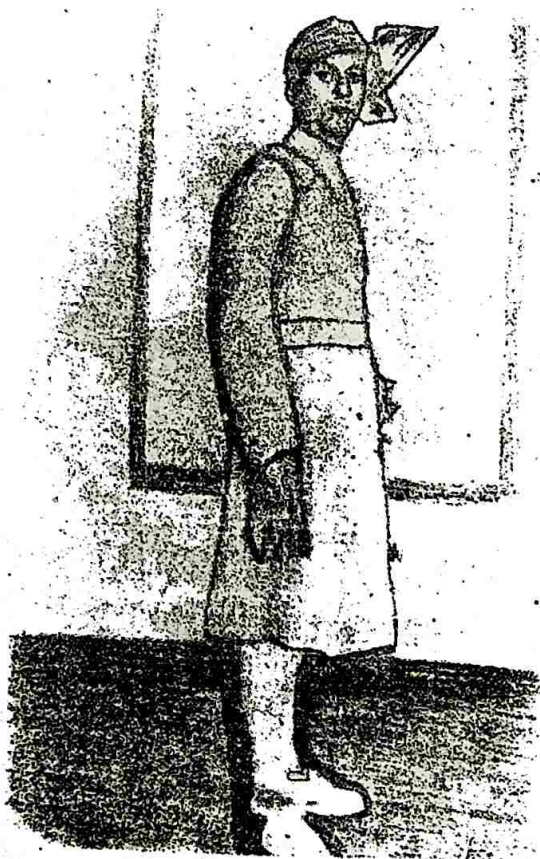
মেজর রাজা ত্রিদিব রায়, চাকমা রাজা
জন্মঃ—১৪ই মে, ১৯৩৩ ইং,

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮